প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৬৭

প্রকাশক শ্রীকানাই সামন্ত
বিশ্বভারতী। ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭

মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্ক্‌স্‌ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ। কলিকাতা-১৩

সূচীপত্র

সূচনা

উনিশ শো ষোলো সালের সেপ্টেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়-বারের মতো যুক্তরাষ্ট্রে যান। প্রথমবার যখন তিনি যুক্তরাষ্ট্রে যান উনিশ শো বারো সালে, রবীন্দ্রনাথ তখন শুধু বাংলার কবি। এবার গেলেন তিনি নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্ত বিশ্বকবিরূপে। সারা দুনিয়ায় তখন কৌতূহল জেগেছে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সৃষ্টি সম্বন্ধে। উনিশ শো ষোলো সালে তিনি যখন আমেরিকায় গেলেন, ইয়োরোপ তখন যুদ্ধ-দানবীর নখরাঘাতে রক্তাক্ত। সভ্যতার যে উপকরণবান সৌধ রচিত হচ্ছিল ইয়োরোপে, তার জাতীয়তাবাদী ভিত্তির অসত্যতা ও ক্ষণভঙ্গুরতা সেদিন প্রমাণ করছিল প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতাগুলি দিলেন যুক্তরাষ্ট্রে সেগুলির মধ্যে 'আমেরিকায় জাতীয়তাবাদ' প্রবন্ধটি তাঁর 'ন্যাশানালিজ্‌ম্' নামক বইটিতে স্থান পেয়েছে। অন্য যে ছটি বক্তৃতা দেন—'আর্ট কী', 'ব্যক্তিত্বের জগৎ', 'দ্বিতীয় জন্ম', 'আমার বিদ্যালয়', 'ধ্যান' ও 'নারী'—সেগুলি উনিশ শো সতেরো সালে 'পার্সোন্যালিটি' নাম দিয়ে বই আকারে ছাপানো হয়। এই বক্তৃতাগুলি লেখা হয় ইংরেজি ভাষায়। এতদিন বাদে এই প্রবন্ধগুলির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হচ্ছে।

আগেই বলেছি যে, এই বক্তৃতাগুলির একটি হল আর্ট সম্বন্ধে। সাহিত্য কী ও সাহিত্যের নীতি কী সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বহু প্রবন্ধ লিখেছেন বাংলা ভাষায়। সেগুলি 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে' ইত্যাদি বইগুলিতে সংকলিত হয়েছে। তা ছাড়া 'পঞ্চভূত', 'যাত্রী', 'জাপানযাত্রী' প্রভৃতি নানান বইয়েতে সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণাগুলি সমুদ্রসৈকতের ঝিনুকের মতো ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্রসাহিত্যে। আন্তর্জাতিক সাহিত্যের ইতিহাসে

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো সাহিত্যিকের নজির নেই যিনি সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে এত গভীরভাবে বিচার করেছেন ও এত প্রচুর লিখেছেন, যিনি একাধারে একজন শ্রেষ্ঠ রসস্রষ্টা ও একজন পয়লা নম্বরের সাহিত্যতত্ত্ববিদ্। এই দুর্লভ সংযোগ দেখি আমরা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তায়।

এই পুস্তিকার 'আর্ট কী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আর্ট সম্বন্ধে তার গোড়াঘেঁষা কয়েকটি ধারণার অবতারণা করেছেন। আর্টের বিচাব কী নীতি অনুসারে করা দরকার, আর্টের উদ্দেশ্য কী, আর্টে সৌন্দর্যের স্থান কোথায়—এই-সব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন প্রবন্ধটিতে। এই প্রবন্ধটি যে সময়ে লেখা, ইয়োরোপ ও আমেরিকায় তখন আর্টের ধারণা আধুনিক যুগের ঢেউয়ের ধাক্কায় বদল হতে লেগেছে। আর্টকে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন-সাধিকা বলে জাহির করবার জন্যে তখন আস্তিন-গোটানো সাহিত্য-বিচারকবা কলম ধরেছেন পাশ্চাত্য-জগতে। আমাদের দেশেও, বিশেষ ক'রে বাংলা দেশে, নকল-নবিশিয়ানা করতে সিদ্ধহস্ত, জীবনের প্রয়োজনে নয়, আধুনিক সাজবার শৌখিনতায় বিভোর বাঙালি শিক্ষিতেরা তখন জৈবিক প্রয়োজন -সাধনকে আর্টের উদ্দেশ্য বলে জাহির করতে শুরু করেছেন। সাহিত্যের গৌরব বিষয়ের গৌরবে— এই অর্থহীন ধ্বনিও তখন শোনা যাচ্ছে সাহিত্যের জগতে।

পাশ্চাত্যের সাহিত্যিক ও সাহিত্য-বিচারকেরা নকল নবিশিয়ানার জন্যে কিন্তু এই নতুন কথা বলেন নি। শুদ্ধ মননশীলতার দিক থেকে বিচার ক'রে ভিত-নড়ে-যাওয়া জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের ছন্দ মেলাবার একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা তাঁরা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটিতে এই সমস্যাগুলির আলোচনা করেছেন। আহমেদাবাদে প্রথম গুজরাট সাহিত্য-সম্মিলনে গান্ধীজির আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে লেখা— 'সৃষ্টি বনাম নির্মিতি' -নামক একটি লিখিত ভাষণ দেন, তাতেও সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে মূল্যবান আলোচনা আছে। 'ব্যক্তিত্বের জগৎ' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ আপাতদৃষ্টিতে যা পরস্পরবিরোধী বলে মনে হয়,— যেমন গতি ও স্থিতি, নিকট ও দূর— তাদের সেই বৈষম্য যে বস্তুকে সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখার জন্যে ঘটছে সেইটে নিয়ে আলোচনা করেছেন। উপনিষদের 'তদ্ এজতি, তন্নৈজতি'— চলছে, চলছে না'ও— গতি শুধু গতি নয়, স্থিতি শুধু স্থিতি নয়— অস্তিত্বের এই রহস্যের মর্ম রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে এই প্রবন্ধে ধরে দিয়েছেন।

নিকট ও দূর— এরা তথ্যের দিক থেকে আলাদা হতে পারে কিন্তু সত্যের দিক থেকে দেখলে এরা এক। বিজ্ঞানী ও নীতিবাগীশ এ বিশ্বকে ও বস্তুজগৎকে খণ্ড ক'রে দেখে বলে সৃষ্টির মর্মকথাটুকু কিছুতেই ধরতে পারে না। ব্যক্তিসত্তার শক্তিই হচ্ছে সৃষ্টির মূলে, ব্যক্তিসত্তাই হচ্ছে প্রকৃত বাস্তব— এই কথা নানা ভাবে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এই লেখাটিতে। 'আমার জগৎ' প্রবন্ধে ও 'শান্তিনিকেতন' বইটির নানা জায়গায় নানা ভাবে এই প্রবন্ধটির মূল ভাব ছড়িয়ে আছে।

শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা স্বদেশী যুগের বহু প্রবন্ধের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। স্বদেশীর যুগে যখন বাইরের আঘাতকে ঠেকাবার জন্যে অধিকাংশ নেতারাই ডাক দিচ্ছিলেন দেশের লোকদের— আর সেই আঘাতকে বাইরে থেকে প্রতিহত করবার প্রয়োজন খুবই ছিল সেদিন— রবীন্দ্রনাথ তখন জাতির জীবনের ন'ড়ে-যাওয়া ভিত্‌কে মজবুত করবার জন্যে আমাদের ডাক দিলেন।

শান্তিনিকেতনের শাল-বীথিতে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে পদচারণ করতে করতে রবীন্দ্রনাথ একদিন জাতীয় শিক্ষার কথা তুল্‌লেন—বল্‌লেন, ত্রিশঙ্কুর অবস্থা থেকে জাতিকে বাঁচাতে হবে, ভারতের মৃত্তিকার গভীরে তার শিকড় নামিয়ে দিতে হবে, তার পরে ভারতীয় সাধনার রস পান ক'রে বীর্যবান হয়ে সারা পৃথিবীর সঙ্গে তার যোগ-স্থাপন করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে গোটা মানুষ তৈরি করা, আর যে আদর্শ-অভিমুখে শিক্ষা আমাদের নিয়ে যাবে সেটি হচ্ছে সর্বজাগতিকতা। আশ্চর্যের কথা ও আমাদের গর্বের কথা যে স্বদেশীর যুগে যখন বিদেশী শক্তির দস্যুতার বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছিলুম, তখন এক দিকে যেমন বিদেশী জিনিস বয়কট, স্বদেশী জিনিস ব্যবহার, শাসকদের সঙ্গে সর্বপ্রকারের সম্বন্ধ বর্জন করবার ও রাখীবন্ধন উৎসব দিয়ে নিজেদের জাতীয় সংহতি ঘোষণা করবার ডাক নেতারা দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার দ্বারা জাতির অন্তরে সর্বজাগতিকতার উদ্‌বোধন করবার ডাকও সেদিন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এসেছিল। জাতীয় শিক্ষাপরিষদের পরিকল্পনা স্বদেশী যুগের নেতাদের সামনে রবীন্দ্রনাথ হাজির করেন ও সমস্ত পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করে দেন। তিনি নিজে অধ্যাপনা করেন, এমন-কি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রগুলিও তৈরি ক'রে দেন।

ও দিকে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা ক'রে শিক্ষা-প্রণালী নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন।

তাঁর বিদ্যালয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দেন ইয়োরোপে ও আমেরিকায়। উইলিয়াম পিয়ার্সনও শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ যখন উনিশ শো ত্রিশ সালে রাশিয়ায় যান তখন সোভিয়েত শিক্ষাবিদদের সঙ্গে

শিক্ষাতত্ত্ব নিয়ে ও শান্তিনিকেতনে তাঁর নিজের শিক্ষাপদ্ধতি কী ভাবে তিনি কাজে লাগাচ্ছেন সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সাত্‌স্কি প্রমুখ সোভিয়েত শিক্ষাবিদেরা শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা শুনে পরম বিস্ময় প্রকাশ করেন। তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের আলোচনা রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটিতে করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ নারীর মুক্তি চেয়েছিলেন সমাজের অত্যাচার থেকে। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে, 'পলাতকা'র কয়েকটি কবিতায়, 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে ও আরো অনেক লেখায় রবীন্দ্রনাথ নারীকে সেবাদাসী ক'রে রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। 'যামিনীর নর্মসহচরী দিবসের কর্মসহচরী' হোক এই কামনা তিনি সব নারীর হয়ে ও যারা যথার্থ পুরুষ তাদের হয়ে 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যে জানিয়েছেন তাঁর যৌবনকালে।

কিন্তু পুরুষের জীবনের নকলনবিশিয়ানা করলে নারীর এই মুক্তিসাধনা যে ব্যর্থ হয়ে যাবে সে কথা রবীন্দ্রনাথ নারীদের বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। পুরুষের হচ্ছে প্রকৃতির বাঁধন কাটিয়ে জীবনের পরিধি বাড়ানোর সাধনা। এটা হচ্ছে শক্তি-সাধনার পথ, কিন্তু এই শক্তিসাধনা আমাদের সর্বনাশের মধ্যে ঠেলে দেয় যদি আমরা শক্তিকে ছন্দের ও মাধুর্যের বন্ধনে বাঁধতে না পারি। এইখানেই নারীর কাজ শুরু হল—জীবনটাকে মাধুর্যের ছন্দে, রূপের ছন্দে বাঁধার কাজ। সমকালীন সভ্যতায় পুরুষের শক্তির ছাপ আছে, কেননা এটা পুরুষের তৈরি সভ্যতা। মেয়েরা ছায়ালোকবাসিনী হয়ে আছে। তাই সংঘাত, তাই যুদ্ধ। যদি মেয়েরা এই সভ্যতাকে গড়ে, তোলবার কাজে অংশ নিত তা হলে শক্তি সৌন্দর্যের বশ্যতা স্বীকার করত। পুরুষের শক্তি-সাধনার দৃষ্টিতে মানুষ হচ্ছে শুধু প্রয়োজন-সাধনের যন্ত্র। মানুষটির

কোনো মূল্যই নেই এই জগতে। মেয়েদের কাছে মানুষটাই সব, মানুষটির জন্যেই তাদের সব দরদ স্নেহ ভালোবাসা।

ভয়ের কথা এই যে, মেয়েরা মুক্তির নাম ক'রে পুরুষের নকল করতে শুরু করেছে। ব্যক্তির খর্বতা সাধন করবার কাজে তারাও পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েদের মনকেও অর্গানিজেশনের মাদকতা এমন করে মত্ত করে তুলেছে যে মানুষকে ভালোবাসার যে অতুল ঐশ্বর্য তাদের সহজাত শক্তি সেই শক্তিকে তারা উপেক্ষা করে নৈর্ব্যক্তিক সংগঠন-প্রিয়তার পিছনে ছুটেছে। সারা পৃথিবীর নারীচিত্তে, বিশেষ ক'রে পাশ্চাত্যের নারীচিত্তে, একটি অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। এটা প্রমাণ করছে যে, যা সহজ তার থেকে মেয়েদের মন সরে যাচ্ছে, তারা উত্তেজনার খোরাক চাচ্ছে পুরুষের কাছ থেকে। এই উত্তেজনার খোরাক মেয়েদের অন্তরের সূক্ষ্ম শক্তিগুলিকে আঘাত করছে। পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যে মেয়েরা নিশ্চয়ই বন্দী থাকবে না, তাদের অপেক্ষা করছে মানবজগৎ, যেটাকে ভালোবাসা দিয়ে গড়ে তুলতে হবে। নৈর্ব্যক্তিক সংগঠনসর্বস্ব সামাজিক আদর্শ নারীর জীবনাদর্শ হতে পারে না।

এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ধারণা নারীর ব্যক্তিত্বের প্রকৃত বিকাশ সম্বন্ধে। 'ধ্যান' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ বাইরের জগৎকে উপকরণ আহবণ ক'রে অন্তরেব মধ্যে সঞ্চয় করার সঙ্গে সত্যকে উপলব্ধি করবার যে পার্থক্য সেটি আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। একটি হচ্ছে আহরণ, অন্যটি হচ্ছে আত্মসমর্পণ। ধন, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি— এ-সব বাইরে থেকে আহরণ করবার জিনিস। কিন্তু সত্যকে উপলব্ধি করবার একটিমাত্র উপায় হচ্ছে সত্যের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেওয়া। দুটি মন্ত্রের ব্যাখ্যা ক'রে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য-বাসীদের বুঝাতে চেয়েছেন ভারতবর্ষের যুগযুগান্তের সত্যলাভের

সাধনা। 'শান্তিনিকেতন' বইটির বহু প্রবন্ধে এই ভাবটি বার বার প্রকাশিত হয়েছে, বিশেষ ক'রে 'সত্যকে দেখা', 'সত্যবোধ' ও 'সত্য হওয়া' এই তিনটি প্রবন্ধে।

'দ্বিতীয় জন্ম' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন কেমন ক'রে মানুষ প্রকৃতির জগতে জন্মলাভ ক'রে প্রকৃতির জগতের বাইরে আপনার একটি নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করে। মানুষ যতক্ষণ সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত ততক্ষণ সে গাছ ও পশুদের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা। যেই প্রকৃতির অন্ধ অচেতন নিয়মের বাঁধন কাটিয়ে মানুষ সচেতনভাবে কর্ম শুরু করল অমনি সে শুরু করল তার নিজস্ব একটি জগৎ সৃষ্টি করতে— চেতনানিয়ন্ত্রিত কর্মের জগৎ। যা-আছে'র জগৎ থেকে মানুষ চল্‌ল উদ্দেশ্যের জগতের দিকে। মানুষের দ্বিতীয় জন্মলাভ হল। বাসনার জগতের সঙ্গে আদর্শের জগতের, যা চাচ্ছে মন তার সঙ্গে মনের যা চাওয়া উচিত, এই দুয়ের মধ্যে সংঘাত শুরু হল মানুষের মনে। শুরু হয়ে গেল মানুষের জগৎ-রচনা। প্রকৃতির বহির্‌ভূত এই জগতে মানুষ তার ব্যক্তি-স্বতন্ত্রতাকে বিশ্বজনীনতার সঙ্গে ছন্দোবদ্ধ করবার জন্যে কী দুঃসহ সাধনাই না করে চলেছে!

'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের কয়েকটি প্রবন্ধে এই 'দ্বিতীয় জন্ম' প্রবন্ধটির মূল ভাবটি রবীন্দ্রনাথ নানা ভাবে ধরে দিয়েছেন আমাদের কাছে।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আর্ট কী ?

এই বিশাল বিশ্বের মুখোমুখি আমরা রয়েছি এবং এর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বহুমুখী। এর একটি হল আমাদের জীবনধারণ, ভূমিকর্ষণ, আহারসংগ্রহ, বস্ত্রপরিধান এবং প্রকৃতি থেকে নানা উপাদান সংগ্রহের সম্পর্ক। যা আমাদেব প্রয়োজন মেটাবে এমন-সব বস্তু আমরা সর্বদাই তৈরি করছি আর এই-সব প্রয়োজন মেটাবার প্রয়াসে প্রকৃতির সংস্পর্শে আমরা নিয়তই আসছি। এইভাবে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও আমাদের সকল শারীবিক প্রয়োজনের মধ্য দিয়ে আমরা সর্বদাই এই বিশাল বিশ্বেব সংস্পর্শে আসছি।

এ ছাড়া রয়েছে আমাদের মন ; আর মন চায় তার খোরাক। মনেবও রয়েছে তার নিজস্ব প্রয়োজন। সে নানা বস্তুর মধ্যে যুক্তিকে খুঁজবেই। মনকে তথ্যের সংখ্যাবহুলতার সম্মুখীন হতে হয়। যখন নানা বস্তুর বিষম সমাবেশে মন ঐক্যবিধায়ক সূত্রটি খুঁজে পায় না তখন সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। মানুষের মনের গঠনই এই রকম যে সে কেবল তথ্যানুসন্ধান করে না, সেই সঙ্গে নিছক সংখ্যা ও পরিমাণের বোঝা লঘু হয় এমন কিছু সূত্র খুঁজে বার সে করবেই।

(এ ছাড়াও আমাদের মধ্যে রয়েছে আর এক মানুষ— সে শারীরিক মানুষ নয়, সে ব্যক্তিগত মানুষ।) এই শেষোক্ত মানুষটির নানা পছন্দ-অপছন্দ আছে, এবং সে তার ভালোবাসার চাহিদা মেটাবার জন্য যা হোক কিছু খুঁজে বার করতে চায়। আমরা যেখানে শরীর ও মন উভয়ের চাহিদার উর্ধ্বে, স্বার্থ ও প্রয়োজনের উর্ধ্বে, যেখানে আমবা সব রকমের চাহিদা থেকে মুক্ত, সেখানেই এই ব্যক্তিগত মানুষের দেখা পাওয়া যায়। মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চ

স্তরে রয়েছে এই ব্যক্তিগত মানুষ। আপন ব্যক্তিত্বকে খুশি করার জন্য সে এই বিশ্বের সংস্পর্শে আসে।

বিজ্ঞানের জগৎ বাস্তবের জগৎ নয়। এ হল শক্তিজগতের এক অমূর্ত প্রকাশ। আমাদের মনীষার সাহায্যে আমরা একে ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু ব্যক্তিত্বের সহায়তায় আমরা এই জগৎকে প্রত্যক্ষ করতে পারি না। এ যেন এক ঝাঁক যন্ত্রবিদ্, ব্যক্তিরূপে এরা আমাদের জন্য নানা বস্তু উৎপাদন করছে বটে, কিন্তু আমাদের কাছে এরা নিছক ছায়া মাত্র রয়ে গেছে।

কিন্তু আর একটি জগৎ আছে যা আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ। এই জগৎকে আমরা দেখি, অনুভব করি ও আমাদের সব অনুভূতি দিয়ে আমরা এর সঙ্গে আদানপ্রদান করি। এর রহস্য অন্তহীন কেননা আমরা একে বিশ্লেষণ বা পরিমাণ— কিছুই করতে পারি না। আমরা কেবল বলতে পারি, এই তো তুমি এখানেই।

এই জগৎ থেকে বিজ্ঞান মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর এখানে আর্ট আপন স্থান গ্রহণ করে। আর আর্ট কী, যদি আমরা এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারি তবে আমরা জানতে পারব আর্টের সঙ্গে যার এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সেই জগৎটাই বা কী।

এই প্রশ্ন যেরকম গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় আসলে সেরকম নয়। কেননা আর্ট জীবনের মতোই আপন প্রাণাবেগে গড়ে উঠেছে এবং মানুষ আর্টের স্বরূপ ঠিকমত না জেনেই এর থেকে আনন্দ লাভ করেছে। আর আমরা পরম নিশ্চিন্তে একে চেতনার সেই তল-দেশে রেখে দিতে পারতুম, যেখানে অন্ধকারে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত নানা বস্তু লালিত হচ্ছে, পুষ্ট হচ্ছে।

কিন্তু আমরা এমন এক যুগে বাস করি যে সময় আমাদের এই পৃথিবীকে ভেতরে বাইরে ওলটপালট করা হচ্ছে এবং তার তল-

দেশে যা-কিছু আছে তাকে উপরিভাগে টেনে আনা হচ্ছে। আমাদের এই জীবনযাত্রা হচ্ছে একটি অবচেতন প্রক্রিয়া। তাকে আমরা আমাদের জ্ঞানের দ্বারা পরীক্ষা না করে ছাড়ছি না যদিচ এই জানার অর্থ হচ্ছে, আমাদের গবেষণার বস্তুকে হত্যা করা এবং তাকে জাদুঘরের দ্রষ্টব্য বস্তু কবে তোলার নামান্তর।

[প্রশ্ন উঠেছে, 'আর্ট কী?' বিভিন্ন ব্যক্তি নানা উত্তর দিয়েছেন এই প্রশ্নের। আমাদের সৃষ্টিশক্তি ও উপভোগের ক্ষমতা— উভয়ই স্বতঃস্ফূর্ত ও অর্ধচেতন।] এই ধবণের আলোচনা সেই স্বতঃস্ফূর্তির ও অর্ধচেতনাব জগতে সচেতন উদ্দেশ্য আমদানি করে। শিল্পবস্তু-বিচারের ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করাব জন্য এই-সব আলোচনা অতি-নির্দিষ্ট পরিমাণ সরববাহ করতে চায়। তার ফলে বহু শতাব্দী ধরে যে অমব শিল্পীদেব নিঃসংশয় প্রাধান্য রয়েছে, তাঁদের সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেবাব জন্যে আধুনিককালের শিল্প-বিচাবকদেব নিজস্ব আইনানুযায়ী রায় দিতে আমবা দেখেছি।

শিল্প-সমালোচনার জগতে এই আবহাওয়া-জনিত বিশৃঙ্খলার উৎস হচ্ছে প্রতীচ্য জগৎ। সেখান থেকে এই দুর্যোগ আমাদের বাংলা দেশের তটভূমিতে এসে পৌঁছেছে, আর যেখানে নির্মল আকাশ ছিল সেখানে নিয়ে এসেছে কুয়াশা ও মেঘ। আমরা নিজেদেরকে প্রশ্ন কবতে শুরু করেছি— শিল্পসৃষ্টিগুলি কী ভাবে বিচারিত হবে? তাদের বিচার কি হবে সর্বত্র উপলব্ধ হবার যোগ্যতার দ্বারা, অথবা জীবনের দার্শনিক ব্যাখ্যানের দ্বারা, অথবা দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধানের উপযোগিতার দ্বারা, অথবা শিল্পী যে সমাজের অন্তর্ভুক্ত সে সমাজের বৈশিষ্ট্যসূচক কোনো কিছুকে রূপদানের যোগ্যতার দ্বারা? সুতরাং যা শিল্পের অন্তর্গত নয় এমন কিছুর দ্বারা শিল্পমূল্যের পরিমাণ স্থির করতে যখন

মানুষ আত্মনিয়োগ করেছে, অন্য কথায়, যখন নদীর উৎকর্ষ খালের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচারিত হতে চলেছে, তখন আমরা ব্যাপারটিকে তার ভাগ্যের উপর কিছুতেই ছেড়ে দিতে পারি না। তখন অবশ্যই আমরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করব।

[আমরা কি কোনো একটি সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা শুরু করব? কিন্তু যার বিকাশ জীবনব্যাপী, তাকে সংজ্ঞার বাঁধনে বাঁধলে, বস্তুটিকে স্পষ্ট করে দেখার সুবিধের জন্যে আপনার দৃষ্টিকেই কিন্তু বেঁধে ফেলা হয়। আর স্পষ্টতা কোনো সত্যের একমাত্র বা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক নিশ্চয়ই নয়। চোরা-লণ্ঠনের দৃষ্টি স্পষ্ট দৃষ্টি, কিন্তু তা সম্পূর্ণ দৃষ্টি নয়। যদি আমরা কোনো গতিশীল চাকাকে জানতে চাই তবে চাকার সব পাখিগুলি গণনা না করলেও চলবে। যখন আকৃতির যথাযথ রূপটি শুধু নয়, গতির দ্রুততাই গুরুত্বপূর্ণ তখন চাকার একটা মোটামুটি অসম্পূর্ণ সংজ্ঞা নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। প্রাণবান বস্তুসমূহের সঙ্গে তাদের পারিপার্শ্বিকের দূরপ্রসারী নানান সম্পর্ক বর্তমান; এর কয়েকটি অদৃশ্য এবং মৃত্তিকার গভীবে প্রসারিত। সংজ্ঞা তৈরির অত্যুৎসাহে আমরা একটি গাছের শাখা ও শিকড় কেটে ফেলে গাছটিকে সহজেই একটা গুঁড়িতে পরিণত করতে পারি। অধ্যয়নগৃহ থেকে গৃহান্তরে গড়িয়ে নিয়ে যাবার পক্ষে সেটি নিশ্চয়ই সুবিধাজনক এবং সে কারণেই তা পাঠ্যপুস্তকের উপযোগীও হতে পারে। কিন্তু এর উলঙ্গ অনাবৃত রূপের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বলেই এ কথা বলা যায় না যে গুঁড়ি একটি সম্পূর্ণ গাছের চেয়ে সত্যতর পরিচয় বহন করে।

এই কারণেই আমি আর্ট-এর সংজ্ঞা নিরূপণ করব না।] পরন্তু এর অস্তিত্ব সম্পর্কে নিজেকেই প্রশ্ন করব এবং জানতে চেষ্টা করব

যে, এর উৎস কোথায়? সেটি কি কোনো সামাজিক উদ্দেশ্যে, না, আমাদের শিল্পবোধের আনন্দের রসদ সরবরাহের চাহিদায়, অথবা প্রকাশের কোনো আবেগের মধ্যে— যে আবেগ আমাদের সত্তারই ধর্ম।

'আর্টের জন্যই আর্ট' (কলাকৈবল্যবাদ)— এই বচনটিকে কেন্দ্র করে বহুকাল ধরে একটি তর্ক আবর্তিত হচ্ছে। পশ্চিমী সমালোচকদের একাংশ এর প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছেন। রক্ষণশীল মনোবৃত্তির দিনে উপভোগের খাতিরে উপভোগ পাপকর্ম বলে মনে করা হত। আজ সেই সন্ন্যাস আদর্শের পুনরুজ্জীবনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সব রক্ষণশীল গোঁড়ামিই প্রতিক্রিয়া মাত্র। এই মনোভাব সত্যকে তার স্বভাবরূপে প্রকাশ করে না। বিপুল ও বিস্তারিত প্রথার জগতে ছুঁৎমার্গী ও অদ্ভুত হয়ে উঠে উপভোগ যখন জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক হারিয়ে বসে, তখন পরিহারের আহ্বান আসে। পরিহার তখন সুখকে ফাঁদ বলে বর্জন করে। আপনাদের আধুনিক আর্টের শিল্পকলার ইতিহাসের আলোচনা করতে আমি চাই না, কেননা তার যোগ্যতা আমার নেই; তথাপি এই সাধারণ সত্য আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, যখন কোনো মানুষ তার আনন্দ-উপভোগেচ্ছাকে বাধা দিয়ে ব্যর্থ করবার চেষ্টা করে ও এই ইচ্ছাকে কেবলমাত্র জানবার বা মানুষের মঙ্গল করার ইচ্ছায় পরিবর্তিত করে, তখন তার কারণ এই যে, তার আনন্দোপভোগের ক্ষমতা নিশ্চিত তার স্বাভাবিক বিকাশ-ক্ষমতা ও সুস্থতা হারিয়ে ফেলেছে।

প্রাচীন ভারতের অলংকারশাস্ত্রের আচার্যেরা এ কথা বলতে দ্বিধাবোধ করেন নি যে, নিরাসক্ত আনন্দ উপভোগই সাহিত্যের প্রাণ। কিন্তু 'উপভোগ' শব্দটি সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করতে

হবে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এর বর্ণচ্ছত্রে রয়েছে এর বিভিন্ন নক্ষত্রের নানা রঙের গভীর ও অন্তহীন রশ্মিধারা। আর্টের জগৎ বিশেষভাবে নিজস্ব উপাদানে পূর্ণ এবং সেগুলি যে নানান আলোক বিকীর্ণ করে তাদের বিশেষ বিশেষ পালা ও গুণ রয়েছে। এদের প্রভেদ নির্ণয় ও এদের উৎস ও বিকাশ সন্ধান করাই আমাদেব কর্তব্য।

[মানুষ ও পশুর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য এই যে, পশু তার প্রয়োজনের সীমার মধ্যেই বিশেষভাবে আবদ্ধ। পশুর বেশির ভাগ ক্রিয়া আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষায় নিযুক্ত। খুচবো দোকানদারির মতো এই জীবন-বাণিজ্যে তার কোনো বড়ো রকম লাভ হয় না। পশুব উপার্জনের বড়ো অংশ তার ব্যাঙ্কে সুদ দিতেই খরচ হয়ে যায়। পশুর বেশির ভাগ সংগতি কেবলমাত্র জীবনধারণের প্রয়াসেই খরচ হয়। কিন্তু জীবনের বাণিজ্যে মানুষ এক বড়ো মহাজন। মানুষ যা খরচ করতে বাধ্য, তার চেয়ে অনেক বেশি সে উপার্জন করে। সেইজন্য মানুষের জীবনে এক বিশাল প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ রয়েছে। এই বাহুল্য তাকে অনেকটা পরিমাণে অপ্রয়োজনীয় ও দায়িত্বহীন হবার সুযোগ দিয়েছে। তার প্রয়োজনের চারদিকে বিশাল ভূখণ্ড পড়ে রয়েছে— এখানে তার এমন-সব বস্তু রয়েছে যেগুলি আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ।

জীবনের প্রয়োজন সাধনের উপযুক্ত জ্ঞান পশুর থাকা প্রয়োজন। কিন্তু সেখানেই পশু থেমে যায়। আহার অন্বেষণ ও আশ্রয় গ্রহণের জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে পশুকে জানতে হয়; বাসস্থান নির্মাণের জন্য নানা বস্তুব কিছু কিছু গুণ জানতে হয়; এবং ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার জন্য

বিভিন্ন ঋতুর কিছু-কিছু লক্ষণও জানতে হয়। মানুষকেও অবশ্য এ-সব জানতে হয় কেননা বাঁচতে তাকে হবেই। কিন্তু মানুষের মধ্যে একটা প্রাচুর্য আছে যেখানে সে গর্বের সঙ্গে জোর দিয়ে ঘোষণা করতে পারে যে, জ্ঞান কেবল জ্ঞানের জন্যই। সেখানে জ্ঞানের বিশুদ্ধ উপভোগ তার আয়ত্তে, কেননা সেখানে জ্ঞানই মুক্তি। এই প্রাচুর্যের উপরেই মানুষের বিজ্ঞান ও দর্শন বিকাশ লাভ করে।]

তা ছাড়া পশুর মধ্যে খানিকটা পরিমাণ পরার্থপরতা আছে। এই পরার্থপরতা পিতৃত্বের, যূথের ও দলবদ্ধ জীবনের। জাতিরক্ষার জন্য এই পরার্থপরতা নিতান্তই আবশ্যক। কিন্তু মানুষের মধ্যে এর চেয়ে অনেক বেশি পরার্থপরতা আছে। যদিও মানবজাতির পক্ষে সাধুতা প্রয়োজনীয় বলে মানুষকে সৎ হতে হয়, মানুষ কিন্তু এই প্রয়োজনীয়তার সীমানা ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে যায়। মানুষের সাধুতা তার অত্যল্প অংশ বা নৈতিক জীবনধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন মাত্র নয়। সে স্বচ্ছন্দে বলতে পারে সাধুতার জন্যই সাধুতা। আর এই সাধুতার সম্পদের উপরেই মানুষের নীতিশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত— সেখানে শ্রেষ্ঠ পন্থা বলেই তার মূল্য নির্ভর করে না, বরং সকল কর্মপন্থাব বিরুদ্ধে যেতে পাবে বলেই তার মূল্য।

[অনাবশ্যকের এই ক্ষেত্রেই 'আর্টের জন্য আর্ট' এই মতবাদের উদ্ভব।] সুতরাং এটি কী ধরণের কর্ম যার প্রাচুর্যের ফলে আর্টের বা শিল্পকলার উদ্ভব, তা এখন নির্ণয়ের প্রয়াস করা যাক্।

[মানুষের এবং পশুর উভয়ের পক্ষেই সুখ, বিরক্তি, ভয়, ক্রোধ ও ভালোবাসার অনুভূতিকে প্রকাশ করা প্রয়োজন। পশুর মধ্যে এই-সব অনুভূতির অভিব্যক্তি তার প্রয়োজনের সীমার সামান্যই

বাইরে গেছে। যদিও মানুষের মধ্যে এই-সব অনুভূতি মূল উদ্দেশ্য সাধনে নিরত আছে, তথাপি তারা ভূমির বহু উর্ধ্বে অসীম আকাশে দূর-দূরান্তরে শাখা বিস্তার করেছে। মানুষের একটি অনুভূতি-শক্তির ভাণ্ডার আছে যার সবটা তার আত্মরক্ষায় নিয়োজিত নয়। এই প্রাচুর্য আর্ট-সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রকাশের পথ খোঁজে, কেননা মানুষের সভ্যতা তার প্রাচুর্যের উপরেই নির্মিত হয়েছে।

যোদ্ধা কেবল প্রয়োজনীয় লড়াই করেই ক্ষান্ত হয় না, সেই সঙ্গে গীতবাদ্যেব সাহায্যে তার মধ্যে যে উন্নততর চেতনা আছে তাকেও প্রকাশ কবে। অথচ যোদ্ধার পক্ষে তা কেবল অপ্রয়োজনীয় নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেটা আত্মঘাতীও বটে। যে মানুষের মধ্যে প্রবল ধর্মানুভূতি আছে সে তার দেবতাকে মন-প্রাণ দিয়ে অর্চনা কবেই ক্ষান্ত হয় না, উপরন্তু তার ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব মন্দিরের জাঁকজমক ও অর্চনাব আড়ম্বরপূর্ণ প্রথাসমূহের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে চায়।

আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যখন এমন একটি অনুভূতির তরঙ্গ জাগ্রত হয় যা তাব উৎপাদক বিষয়ের ধারণশক্তিকে বহুগুণে অতিক্রম করে যায়, তখন সে অনুভূতি আমাদের কাছে ফিরে আসে এবং ফিবে-আসা তবঙ্গেব ধাক্কায় আমাদের আত্মসচেতন করে তোলে। আমবা যখন দবিদ্র, তখন আমাদের সকল মনোযোগ বাইরে সেই-সব বস্তুর প্রতি নিবদ্ধ হয় প্রয়োজনের খাতিরে যেগুলি আমাদের সংগ্রহ করতেই হবে। কিন্তু যখন আমাদের সম্পদ আমাদের প্রয়োজনকে বহুগুণে অতিক্রম করে যায়, এর আলো তখন ফিরে এসে আমাদের উপর প্রতিফলিত হয় এবং তখন আমরা যে ধনী ব্যক্তি, এই অনুভূতির উল্লাস আমাদেব পরিব্যাপ্ত করে। সকল প্রাণীর মধ্যে কেবল মানুষই যে নিজেকে জানে

—তার কারণ হচ্ছে এই যে, তার জ্ঞানের ঝোঁক তার কাছে অতিরিক্ত রূপে ফিরে আসে। অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা তার ব্যক্তিত্বকে মানুষ যে অনেক বেশি গভীরভাবে উপলব্ধি করে তার কারণ হচ্ছে এই যে, জানার বিষয়গুলির জন্যে যে অনুভূতির প্রয়োজন, মানুষের অনুভূতির শক্তি তার চেয়ে অনেক বেশি। তার ব্যক্তিত্ব— চেতনার এই প্রাচুর্য অভিব্যক্তির পথ খোঁজে। সুতরাং আর্টে শিল্পকলায় মানুষ নিজেকেই প্রকাশ করে, তার বিষয়কে নয়। সংবাদ-গ্রন্থে ও বিজ্ঞানে তাদের বিষয়গুলির স্থান আছে, সেখানে মানুষ কিন্তু নিজেকে সম্পূর্ণরূপে লুকিয়ে ফেলে।

আমি জানি 'ব্যক্তিত্ব' শব্দটি ব্যবহার করে আমি বিনা প্রতিবাদে এগিয়ে যেতে পারব না; এই শব্দটির নানা অর্থ আছে। এই সমস্ত শিথিল-প্রযুক্ত শব্দ বিভিন্ন মতবাদের প্রসঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পাবে, কেননা এদের কেবল যে বিভিন্ন আয়তন আছে তা নয়, বিভিন্ন আকৃতিও আছে। এগুলি যেন হল্-ঘরে-ঝোলানো নানা বর্ষাতি; অন্যমনস্ক ব্যক্তিরা অধিকারী না হয়েও এর যে কোনো একটা নিয়ে যেতে পারে।

মানুষ জ্ঞাতারূপে সম্পূর্ণ নয়, তার সম্পর্কে তথ্যগুলি তাকে প্রকাশ করে না। কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে সে ইন্দ্রিয়সম্ভূত মানুষ। তার পারিপার্শ্বিক থেকে নানা জিনিস নিজের মতো করে বেছে নেবার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা তার আছে। তার আকর্ষণ ও প্রতিনিবৃত্তির ক্ষমতা আছে; এই ক্ষমতাগুলির দ্বারা মানুষ কেবল বাইরের নানা দ্রব্যই সংগ্রহ করে না, সে নিজেকেও রচনা করে। যে মুখ্য সৃজন-শক্তিগুলি বাইরের দ্রব্যকে রূপান্তরিত করে আমাদের জীবনের কাঠামোয় পৌঁছে দেয়, সেগুলি হচ্ছে আবেগসম্ভূত শক্তি। একজন মানুষ যেখানে ধর্মপরায়ণ সেখানে সে ব্যক্তি; কিন্তু যেখানে

সে নিছক ধর্মতত্ত্ববিৎ সেখানে সে ব্যক্তি নয়। ঈশ্বরের জন্য তার অনুভূতি সৃজনশীল, কিন্তু ঈশ্বর সম্পর্কে নিছক জ্ঞান তার সত্তার অংশ হতে পারে না, কারণ তাতে অনুভূতির আগুন নেই।

এই ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলি কী এবং বাইরের জগতের সঙ্গে তা কী ভাবে সম্পর্কিত, তা এখানে বিচার করা যাক। এই জগৎ আমাদের কাছে এক স্বতন্ত্র সত্তা বলে দেখা দেয়, অদৃশ্য শক্তি-সমূহের একটি বাণ্ডিল বলে মনে হয় না। প্রত্যেকেই জানেন যে, তার কারণ, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম ও মনের কাছে এই জগৎ বিশেষভাবে ঋণী। এই বাহ্য জগৎ মানুষের জগৎ। আমাদের অনুভব-শক্তির বিশিষ্ট পাল্লা ও গুণানুযায়ী এই জগৎ তার বিশেষ আকৃতি, রঙ ও গতির বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছে। আমাদের সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়গুলি যা সব বস্তু বিশেষভাবে আমাদের জন্য সংগ্রহ করেছে, গড়ে তুলেছে এবং যেগুলিকে ঘিরে সীমার প্রাচীর তুলে দিয়েছে— তা নিয়েই এই জগৎ। কেবল শারীরিক ও রাসায়নিক শক্তি নয়, সেই সঙ্গে মানুষের অনুভব-শক্তিও এই জগতের শক্তিশালী উপাদান— কেননা এ জগৎ মানুষের জগৎ, পদার্থবিদ্যা বা দর্শন-বিদ্যার অমূর্ত জগৎ নয়।

মানুষের অনুভূতির ছাচে এই জগৎ তার আকৃতি গ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু এখনো এই জগৎ মানুষেব ইন্দ্রিয়গ্রামের ও মনের মাত্র একাংশ হয়ে আছে। এ জগৎ যেন অতিথিব মতো মানুষের কাছে আছে, আত্মীয়ের মতো নয়। এ জগৎ তখনই সম্পূর্ণরূপে আমাদের নিজেদের হতে পারে যখন সে আমাদের আবেগসমূহের পাল্লার মধ্যে এসে পড়ে। আমাদের ভালোবাসা ও ঘৃণা, উপভোগ ও বেদনা, ভয় ও বিস্ময় সর্বদাই এর ওপর কাজ করছে, ও তার ফলে এই জগৎ আমাদের ব্যক্তিত্বের একটি অংশ হয়ে উঠছে। এই

জগৎ আমাদের বৃদ্ধির সঙ্গে বৃদ্ধি পায়, আমাদের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। এই সম্পর্ক স্বীকরণের গুরুত্ব ও ক্ষুদ্রতা অনুযায়ী, এর পূর্ণ যোগফলের উৎকর্ষানুযায়ী, আমরা বড়ো বা ছোটো হই। যদি এই জগৎকে সরিয়ে নেওয়া হয় তবে আমাদের ব্যক্তিত্ব তার সমস্ত আধেয় থেকে চ্যুত হয়।

আমাদের আবেগসমূহ হচ্ছে পাকস্থলীর বিবিধ রসের মতো। এই রসগুলি বাইরের জগৎকে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ ভাবানুভূতিতে পরিবর্তিত করে। অপরপক্ষে, এই বাইরের জগতের নিজস্ব রসসমূহ আছে। তারা বিভিন্ন গুণানুযায়ী আমাদের আবেগপ্রধান ক্রিয়াগুলিকে উত্তেজিত করে। আমাদের সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে একে বলে 'রসঃ'। আমাদের আবেগসমূহের অন্তঃস্থ রস বাইরের রসে সাড়া দেয়। এই মতানুযায়ী একটি কবিতা হচ্ছে একটি বা কয়েকটি রসপূর্ণ বাক্য যা আবেগের রসকে নাড়া দেয়। এই রস আমাদের কাছে নানা ভাব নিয়ে আসে, অনুভূতি দ্বারা তাদের প্রাণসঞ্চার করে, এবং আমাদেব প্রকৃতির জীবন-ধাতুর সঙ্গে অঙ্গীকৃত হবার জন্য তাদের তৈরি করে দেয়।

নিরাভরণ তথ্যবিবৃতি সাহিত্য নয়, কেননা আমাদের থেকে স্বতন্ত্র কিছু তথ্যই সেই বিবৃতি আমাদের দিয়ে থাকে। সূর্য গোলাকার, জল তরল, আগুন গরম— এই-সব তথ্যের পুনরাবৃত্তি অসহ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু সূর্যোদয়ের সৌন্দর্যের বিবরণ আমাদের কাছে চিরন্তন ঔৎসুক্যের বিষয়— কেননা সেখানে এই বর্ণনা সূর্যোদয়ের তথ্যমাত্র নয়, আমাদের সঙ্গে সূর্যোদয়ের যে সম্পর্ক রয়েছে, তারই অভিব্যক্তি— আর সেইজন্যেই সেটি আমাদের চিরন্তন ঔৎসুক্যের বিষয়।

উপনিষদে এ কথা বলা হয়েছে যে, সম্পদ আমাদের প্রিয়, তা

এই কারণে নয় যে আমরা কেবল সম্পদকেই চাই, আমরা নিজেদের চাই বলেই সম্পদ আমাদের প্রিয়। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, সম্পদের মধ্যে আমরা নিজেদের অনুভব করি, আর সে-কারণেই একে ভালোবাসি। যে-সব বস্তু আমাদের আবেগসমূহকে জাগ্রত করে, তারা আমাদের আত্মানুভূতিতে জাগ্রত করে তোলে। এ হ'ল বীণার তারে আমাদের স্পর্শের মতো : যদি তা খুব দুর্বল হয়, তবে আমরা কেবল স্পর্শটুকু জ্ঞাত হই ; কিন্তু যদি তা সবল হয়, তবে আমাদের স্পর্শ আমাদের কাছেই সুরের মধ্যে ফিরে আসে এবং আমাদেব চেতনা ঘনীভূত হয়।

এ ছাড়া আছে বিজ্ঞানের জগৎ— সেখান থেকে আমাদের ব্যক্তিত্বের সকল উপাদান সযত্নে সরানো হয়েছে। আমরা আমাদের অনুভূতি দিয়ে অবশ্যই একে স্পর্শ করব না। কিন্তু এ ছাড়াও রয়েছে বিশাল জগৎ ; আমাদের ব্যক্তিগত জগৎ। আমরা এই জগৎকে জেনে একধারে সরিয়ে রাখব না, আমরা অবশ্যই এই জগৎকে অনুভব করব, কারণ, একে অনুভব করার দ্বারাই আমরা নিজেদেরও অনুভব করতে পারব।

কিন্তু যাকে আমরা কেবলমাত্র অনুভবের দ্বারা জানি, আমাদের সেই ব্যক্তিত্বকে আমরা কী ভাবে প্রকাশ করতে পারি ? বিশ্লেষণ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে একজন বৈজ্ঞানিক যা শিখেছেন, তা তিনি জানাতে পারেন। কিন্তু একজন শিল্পীর (আর্টিস্টের) যা বলার আছে, কেবল বিবরণ দিয়ে ও ব্যাখ্যা ক'রে তিনি তা প্রকাশ করতে পারেন না। যখন একটি গোলাপফুল সম্পর্কে আমি যা জানি তা আমাকে বলতে হবে, তখন নিতান্ত সাদা-মাটা ভাষার প্রয়োজন। কিন্তু যখন একটি গোলাপফুল সম্পর্কে আমার অনুভূতি জ্ঞাপন করতে হবে, তখন অবস্থা ভিন্নতর। সেখানে

তথ্যের বা আইনের সঙ্গে কোনো যোগ নেই— এই ফুল কেবল আস্বাদন নিয়ে ব্যবহার করে, আমাদের আস্বাদন প্রক্রিয়ার দ্বারাই জানা যায়। সেইজন্য সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বলেন, কবিতায় আমাদের এমন-সব শব্দ ব্যবহার করতে হবে যাদের ঠিকমত আস্বাদ্যমানতা আছে— যা কেবলমাত্র কথায় ভরা নয়, উপরন্তু যে শব্দগুলি নানা ছবির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে এবং গান করে। কারণ ছবি ও গান কেবলমাত্র তথ্য নয়। তারা ব্যক্তিগত তথ্য। তারা কেবল নিজেরা নয়, তারা আমরাও বটে। তারা বিশ্লেষণকে অগ্রাহ্য করে এবং আমাদের হৃদয়ে তৎপর প্রবেশ লাভ করে।

[এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে প্রয়োজনের জগতেও প্রকাশ না ক'রে পারে না। কিন্তু আত্মপ্রকাশ তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য নয়। দৈনন্দিন জীবনে যখন আমরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমাদের অভ্যাসের দ্বারা চালিত হই, আমরা তখন প্রকাশের ক্ষেত্রে কৃপণ ; কারণ তখন আমাদের আত্মচেতনা তার সর্বনিম্ন স্তরে থাকে— এর কেবল সেইটুকু শক্তিই থাকে যা অভ্যস্ত পথে নিয়ন্ত্রণের পক্ষে পর্যাপ্ত। কিন্তু যখন আমাদের হৃদয় ভালোবাসায় সম্পূর্ণ জাগ্রত হয়, অথবা অন্য কোনো বড়ো আবেগে বিচলিত হয়, তখন আমাদের ব্যক্তিত্ব আবেগবন্যায় ভরে ওঠে। তখন আমাদের ব্যক্তিত্ব কেবল প্রকাশের জন্যই প্রকাশ-ব্যাকুলতায় অস্থির হয়ে ওঠে। তখনি আসে আর্ট (শিল্পকলা),] এবং আমরা প্রয়োজনের দাবীকে ভুলে যাই, প্রয়োজনের কার্পণ্যকে ভুলি— তখন আমাদের মন্দিরের চূড়াগুলি আকাশকে চুম্বন করতে উদ্যত হয় এবং অজ্ঞাতের গভীরে উপনীত হবার জন্য আমাদের সংগীতের সুরগুলি ব্যাকুল হয়।

মানুষের শক্তিগুলি দুটি সমান্তরাল রেখায়— প্রয়োজনের ও

আত্মপ্রকাশের রেখায়— চলে এবং তারা সাক্ষাৎ করতে ও মিলিত হতে চায়। আমাদের প্রয়োজনের বস্তুসমূহের চার দিকে নিরন্তর মানবসঙ্গের ফলে নানা হৃদয়ানুভূতি জড়ো হয় এবং নিজেদের আত্মপ্রকাশের জন্যে আর্টের সাহায্য প্রার্থনা করে— তখন অলঙ্কৃত তরবারি-ফলকে যোদ্ধার গর্ব ও ভালোবাসার প্রকাশ লক্ষ্য করি এবং উৎসব-সমাবেশে সুরাপাত্রে বন্ধুত্বের অভিব্যক্তি দেখি।

রীতি অনুযায়ী আইন-ব্যবসায়ীর আপিস সৌন্দর্যবস্তু নয়, এবং তার কারণ খুব স্পষ্ট। কিন্তু নগরে যেখানে মানুষ তার নাগরিকতার জন্য গর্বিত, সেখানে সরকারী প্রাসাদগুলি অবশ্যই তাদের গঠনে নগরীর প্রতি এই ভালোবাসাকে প্রকাশ করবে। যখন কলকাতা থেকে দিল্লীতে বৃটিশের রাজধানী স্থানান্তরিত হ'ল, তখন নতুন অট্টালিকা নির্মাণে স্থাপত্যের কোন্ রীতি অনুসৃত হওয়া উচিত, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। কেউ কেউ মুঘলযুগের ভারতীয় স্থাপত্যরীতির পক্ষে ওকালতি করেছিলেন। এই রীতি মুঘল ও ভারতীয় প্রতিভার যুগ্ম ফল। তাঁরা এই তথ্যটি ভুলেছিলেন যে, সকল সত্য আর্টের উৎস হৃদয়ানুভূতিতে নিহিত। মুঘল দিল্লী ও মুঘল আগ্রা তাদের সৌধরাজির মাধ্যমে মানবিক ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করেছে। মুঘল সম্রাটেরা মানুষ ছিলেন, তাঁরা কেবলমাত্র শাসক ছিলেন না। তাঁরা ভারতেই বাস করেছিলেন ও মারা গিয়েছিলেন, তাঁরা ভালোবেসেছিলেন ও যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁদের রাজ্যের স্মৃতিস্তম্ভগুলি কারখানা ও আপিসের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নেই, মৃত্যুহীন শিল্পকৃতিতে রয়েছে— বিরাট সৌধমালায় কেবল নয়, উপরন্তু চিত্রাবলীতে ও সংগীতে, পাষাণ ও ধাতুর খোদাই কর্মে, তূলা ও পশমের বস্ত্রশিল্পে রয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে বৃটিশ সরকার মানবিক গুণসম্পন্ন নয়। এ আপিসী ছাঁচে তৈরি ও সে কারণেই

অমূর্ত। আর্টের সত্য ভাষায় প্রকাশ করার মতো কিছুই এর নেই। কারণ আইন, দক্ষতা ও শোষণ মহৎ প্রস্তরগাথায় নিজেদের জয়গীতি রচনা করতে পারে না। লর্ড লীটন্ দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষের একজন রাজপ্রতিনিধির পক্ষে যতটা প্রয়োজন তদপেক্ষা বেশি পরিমাণ কল্পনাশক্তিতে ভূষিত ছিলেন। তিনি মুঘলদের একটি সরকারী সমারোহ-অনুষ্ঠানের নকল করতে চেষ্টা করেছিলেন— তা হ'ল দরবার-অনুষ্ঠান। কিন্তু সরকারী সমারোহ-অনুষ্ঠানগুলি শিল্পকর্ম। সেগুলি স্বভাবতই প্রজাবর্গ ও তাদের রাজার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। যখন সেগুলি কেবল নকল মাত্র তখন তারা জাল দ্রব্যের সব লক্ষণ প্রকাশ করে।

ব্যবহারোপযোগিতা ও হৃদয়াবেগ কী ভাবে তাদের প্রকাশের ভিন্ন পথ খোঁজে, তা পুরুষের পোশাকের সঙ্গে রমণীর পোশাকের তুলনা করলেই দেখা যাবে। নিয়ম অনুযায়ী পুরুষের পোশাক সকল অপ্রয়োজনীয়কে ও নিতান্ত অলঙ্করণকে বর্জন করে। কিন্তু রমণীমাত্রেই স্বভাবতই কেবল পোশাকে নয়, তার আচার-ব্যবহারেও অলঙ্করণ ও সজ্জা পছন্দ করে। রমণীকে চিত্রার্পিত ও গীতসমৃদ্ধ হতে হয় সে নিজে যা তা প্রকাশের জন্য ; কারণ, জগতে রমণীরূপে তার যে ভূমিকা, তাতে রমণী পুরুষ অপেক্ষা আরও বাস্তব ও ব্যক্তিগত। তাকে তার নিতান্ত উপযোগিতার দ্বারা বিচার করলে চলবে না, বরং তার আনন্দময়তার দ্বারা বিচার করতে হবে। সেই কারণে রমণী তার বৃত্তিকে নয়, তার ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করার জন্য অশেষ যত্ন নিয়ে থাকে।

আর্টেরও মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, এবং যা বিমূর্ত ও বিশ্লেষণমুখী তাকে সে প্রকাশ করে না, এবং সেজন্যে আর্ট তার প্রয়োজনের খাতিরে ছবি ও গানের ভাষা ব্যবহার করে। এর

ফলে আমাদের চিন্তাক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তাতে মনে হয় আর্টের উদ্দেশ্য সৌন্দর্যের উৎপাদন ; পরন্তু আর্টের ক্ষেত্রে সৌন্দর্য কেবল উপায় মাত্র। সৌন্দর্য আর্টের সম্পূর্ণ ও অন্তিম অভিপ্রায় নয়।

ফলে আমরা প্রায়ই এই তর্ক শুনি যে, পদার্থ অপেক্ষা রীতি আর্টের একান্ত আবশ্যকীয় উপাদান কি না। এ ধরণের তর্ক অন্তহীন, এ যেন তলদেশহীন পাত্রে জল ঢালার মতো। এই-সব আলোচনার মূল এই ধারণায় যে আর্টের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য। কিন্তু যেহেতু নিতান্ত পদার্থের সৌন্দর্যের গুণ নেই, তাই প্রশ্ন দাঁড়ায় যে রীতি আর্টের প্রধান কারণ কি না।

কিন্তু সত্য এই যে— বিশ্লেষণমুখী আলোচনা আর্টের মূল ব্যাপারটি কী, তা আবিষ্কারে আমাদের সাহায্য করবে না। কারণ আর্টের যথার্থ সূত্র হচ্ছে ঐক্যসূত্র। যখন আমরা কোনো আহার্য দ্রব্যের খাদ্যমূল্য জানতে চাই, তখন তার সন্ধান পাই তার উপাদান-অংশগুলিতে। কিন্তু এর আস্বাদনমূল্য এর ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তা বিশ্লেষণ করা যায় না। পদার্থ স্বতন্ত্ররূপে একটি বিমূর্ত সত্তা, বিজ্ঞানের দ্বারা তা পরীক্ষা করা যায়। আর রীতি যা আসলে রীতি মাত্র, তা এমন বিমূর্ত সত্তা যা অলঙ্কারশাস্ত্রের আইনের আওতায় পড়ে। কিন্তু যখন তারা অবিচ্ছেদ্যরূপে এক, তখন তারা ব্যক্তিত্বের সুবের সঙ্গে সঙ্গতি লাভ করে, আর এই ব্যক্তিত্ব পদার্থ ও রীতি, চিন্তা ও বস্তু, উদ্দেশ্য ও কর্মের মিলিত জটিল সংস্থান।

সুতরাং আমরা দেখি যে, যথার্থ আর্টে বিমূর্ত ভাবের কোনো স্থান নেই, এবং এ ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পেতে হলে, তাদের অতি অবশ্যই ব্যক্তিরূপের ছদ্মবেশে আসতে হবে। এই হচ্ছে কারণ

যেজন্যে কাব্য প্রাণবন্ত শব্দ নির্বাচনের প্রয়াসী— সেই-সব শব্দই প্রয়োজন যা সংবাদমাত্র নয়, পরন্তু আমাদের হৃদয়ে স্বভাবগত হয়ে গেছে, এবং হাটেবাজারে অবিরত ব্যবহারের ফলে যাদের আকৃতি নষ্ট হয়ে যায় নি। উদাহরণরূপে বলি, ইংরেজী শব্দ 'কনশাস্‌নেস্‌' এখনো পর্যন্ত এর পাণ্ডিত্যপূর্ণ জড়তার গুটিপোকার অবস্থা অতিক্রম করে নি, ফলে কাব্যে কদাচিৎ এর ব্যবহার হয়। বিপরীতক্রমে এর ভারতীয় প্রতিশব্দ 'চেতনা' একটি প্রাণবন্ত শব্দ, তা-ই এর নিরন্তর কাব্যগত ব্যবহার ঘটে। অপরপক্ষে, ইংরেজী শব্দ 'ফীলিং' জীবনের সঙ্গে ভাসমান। কিন্তু এর বাংলা প্রতিশব্দ 'অনুভূতি' কাব্যক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কারণ এব কেবল একটি অর্থ আছে, কোনো সৌরভ নেই। এই রকম আরো কিছু সত্য বিজ্ঞান ও দর্শন থেকে এসে জীবনের বঙ ও রুচি আহরণ করেছে, আবাব কিছু সত্য তা করে নি। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তা না করছে, ততক্ষণ তারা আর্টের ক্ষেত্রে রান্না-না-করা শাকসব্‌জির মতো, তা ভোজে পরিবেশনের অনুপযুক্ত। ইতিহাস যতক্ষণ পর্যন্ত বিজ্ঞানের নকল করে ও অমূর্ত চিন্তা নিয়ে নাড়াচাড়া করে, ততক্ষণ তা সাহিত্যের রাজ্যের বাইরে থাকে। কিন্তু ঘটনাবলীর বিবরণীরূপে ইতিহাস মহাকাব্যের পাশাপাশি স্থানগ্রহণ করে। কারণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিবরণী সময়ের পরিচয় দেয়, এ ক্ষেত্রে তারা ব্যক্তিত্বের রুচির অন্তর্ভুক্ত। এই-সব সময়-পর্ব আমাদের কাছে জীবন্ত হয়ে ওঠে, আমরা তাদের হৃৎস্পন্দন অনুভব করি।

এই জগৎ ও ব্যক্তিগত মানুষ মুখোমুখি হয়ে আছে, বন্ধুর মতো জিজ্ঞাসাবাদ করছে ও অন্তর্গূঢ় রহস্য আদানপ্রদান করছে। জগৎ অন্তরের মানুষকে প্রশ্ন করে—'বন্ধু, তুমি কি আমাকে দেখেছ, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো— যে তোমাকে খাদ্যদ্রব্য ও ফলমূল

দিচ্ছে তাকে নয়, যার আইনাদি তুমি আবিষ্কার করেছ তাকে নয়, পরন্তু যে তোমার কাছে ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র, সেভাবে কি তুমি আমাকে ভালোবাসো ?'

শিল্পীর উত্তর, 'হ্যাঁ, আমি তোমাকে দেখেছি, আমি তোমাকে ভালোবাসি ও জানি— তোমাকে আমার প্রয়োজন আছে বা তোমাকে গ্রহণ করেছি ও তোমার আইনাদি আমার ক্ষমতার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছি বলে নয়। সেই-সব শক্তি যা ক্রিয়া করে, চালনা করে ও ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে, তাদের আমি জানি, কিন্তু এ ভালোবাসা তা নয়। আমি তোমাকে সেখানেই দেখি যেখানে তুমি আছ এবং আমি আছি।'

কিন্তু আপনি কিভাবে জানেন যে— শিল্পী জেনেছেন, দেখেছেন, ও এই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মুখোমুখি এসেছেন ?

যখন আমি বন্ধু-নয় এমন কোনো ব্যক্তিকে প্রথম দেখি, তখন তার মধ্যে প্রথম দৃষ্টিতেই যে-সব অসংখ্য অপ্রয়োজনীয় বস্তু আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের দেখি : এবং এই তথ্যবৈচিত্র্যের অরণ্যে যে আমার বন্ধু হবে, তাকে হারাই।

যখন আমাদের স্টীমার জাপানের উপকূলে পৌঁছেছিল, তখন আমাদের মধ্যে একটি জাপানী যাত্রী ছিলেন যিনি রেঙ্গুন থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। অপরপক্ষে আমরা আমাদের জীবনে এই প্রথম ঐ কূলে পৌঁছেছিলাম ; আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিরাট পার্থক্য ছিল। আমরা প্রতিটি ক্ষুদ্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছিলাম, এবং অসংখ্য ছোটো ছোটো বিষয় আমাদের মনোযোগ অধিকার করেছিল। কিন্তু জাপানী যাত্রীটি তৎক্ষণাৎ তাঁর দেশের ব্যক্তিত্বে ও আত্মায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন, সেখানে তাঁর আত্মা তৃপ্তি পেয়েছিল। তিনি অল্পতর বিষয় দেখেছিলেন, আমরা বহুতর বিষয় দেখেছিলাম। কিন্তু তিনি

দেখেছিলেন জাপানের আত্মা। কোনো পরিমাপ বা সংখ্যার দ্বারা দেখাকে পরিমাপ করা যায় না; অদৃশ্য ও গভীর কিছুর দ্বারা এর পরিমাপ করা যায়। এ কথা বলা যায় না যেহেতু আমরা অসংখ্য জিনিস দেখেছি, সেহেতু আমরা জাপানকে আরো ভালো করে দেখেছি; বরং বিপরীতটাই সত্য।

যদি আপনি আমাকে কোনো বিশেষ গাছের ছবি আঁকতে বলেন, এবং যদি আমি শিল্পী না হই, তবে আমি প্রতিটি খুঁটিনাটি নকল করতে চেষ্টা করব পাছে আমি অন্যভাবে এগোলে ঐ গাছটির বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলি। এর ফলে ভুলে যাই যে, বিশেষত্ব ব্যক্তিত্ব নয়। কিন্তু যখন সত্যকারের শিল্পী আসেন, তিনি সকল খুঁটিনাটি উপেক্ষা করেন এবং একান্ত আবশ্যকীয় চরিত্র চিত্রণের কর্মে আত্মনিয়োগ করেন।

আমাদের যুক্তিবাদী মানুষও সব বিষয়কে তাদের অন্তর্নিহিত সূত্রের অনুসরণে সরলীকরণ করতে চায়; সকল খুঁটিনাটি থেকে মুক্তি পেতে চায়; যেখানে সব বিষয় এক সেখানে সকলের অন্তরে পৌঁছতে চায়। কিন্তু পার্থক্য এইখানে যে— বিজ্ঞানী এমন একটি অ-ব্যক্তিক ঐক্যসূত্র সন্ধান করেন যা সকল বিষয়েই প্রয়োগ করা যাবে। উদাহরণস্বরূপ বলি, যে মানবদেহ ব্যক্তিগত, তাকে বিনষ্ট ক'রে তিনি অ-ব্যক্তিক ও সাধারণ শারীরবিদ্যার সন্ধান করেন।

কিন্তু যা এখনো পর্যন্ত বিশ্বজগতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, সেই অদ্বিতীয়কে, সেই ব্যক্তিকে শিল্পী সন্ধান করেন। যখন তিনি একটি গাছকে দেখেন, তখন তিনি গাছটিকে অদ্বিতীয়রূপে দেখেন, উদ্ভিদতত্ত্ববিদের মতো তার সাধারণীকরণ ও শ্রেণী বিভাগ করেন না। শিল্পীর কর্তব্য সেই একটি গাছকে বিশেষরূপে দেখা। তিনি

কিভাবে তা করেন ? অদ্বিতীয়ের অনৈক্যস্বরূপ বিশেষত্বের মাধ্যমে গাছটিকে দেখেন না, পরন্তু ঐক্যের প্রকাশব্যক্তিত্বের মাধ্যমে দেখেন। সুতরাং তাঁকে বাইরের পারিপার্শ্বিকের সকল জিনিসের মধ্যে সেই একের অন্তর্গূঢ় ঐক্য সন্ধান করতে হয়।

প্রাচ্য আর্টের, বিশেষতঃ জাপান ও চীনদেশের আর্টের, মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য এখানেই নিহিত যে সেখানকার শিল্পীরা বস্তুর অন্তরালে এই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাতে বিশ্বাস করেন। পশ্চিম হয় তো মানুষের আত্মায় বিশ্বাস করে, কিন্তু সে সত্য সত্য বিশ্বাস করে না যে এই বিশ্বের একটি আত্মা আছে। তত্রাচ এই-ই হল প্রাচ্যের বিশ্বাস, এবং মানবজাতির কাছে প্রাচ্যের সমগ্র মানসিক দান এইভাবে পূর্ণ হয়েছে। সুতরাং প্রাচ্যদেশে আমবা খুঁটিনাটিতে যাবার ও তাদের উপর জোর দেবার প্রয়োজন বোধ করি না, কেননা সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই বিশ্ব-আত্মা। এরই জন্য প্রাচ্যের ঋষিরা ধ্যানে বসেছেন, এবং প্রাচ্যদেশীয় শিল্পীবা তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে শিল্পক্ষেত্রে একে উপলব্ধি করেছেন।

এই বিশ্ব-আত্মায় আমাদের বিশ্বাস আছে বলে আমরা প্রাচ্যের মানুষরা জানি যে সত্য, ক্ষমতা ও সৌন্দর্য সরলতায় নিহিত আছে— সেখানে তা স্বচ্ছ, সেখানে নানা জাগতিক বস্তু অন্তর্দৃষ্টির পথকে রুদ্ধ করে না। সুতরাং আমাদের সকল ঋষি তাঁদের জীবনকে সরল ও শুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। কারণ এইভাবেই তাঁরা একটি যথার্থ সত্যকে উপলব্ধি করেছেন, এই সত্য যদিও অদৃশ্য তবু তা স্থূল ও সংখ্যাবহুল তথ্য অপেক্ষা অধিকতর বাস্তব।

যখন আমরা বলি আর্ট কেবলমাত্র সেই-সব সত্য নিয়ে ব্যবহার করে যা ব্যক্তিগত, তখন আমরা আপাত-বিমূর্ত দার্শনিক

ভাবগুলিকে বর্জন করি না। আমাদের ভারতীয় সাহিত্যে তারা খুবই পরিচিত, কারণ তারা আমাদের ব্যক্তিগত স্বভাবের সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত। আমি এখানে একটি উদাহরণ দিচ্ছি যা আমার বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তুলবে। নিম্নধৃত অংশটি মধ্যযুগের ভারতের জনৈকা মহিলা কবি-রচিত একটি ভারতীয় কবিতার অনুবাদ ; এর বিষয়বস্তু জীবন।

অঙ্কুরিত বীজের মতো জীবনকে আমি প্রণাম করি ;
তাব এক বাহু আকাশে উত্থিত, অপর বাহু মৃত্তিকায় প্রোথিত ;
এ সেই জীবন যা বহিরঙ্গে ও আন্তররসে একই ;
জীবন যা চিরপ্রকাশমান অথচ চিরপলায়মান।
যে জীবন আসছে আর যে জীবন চলে যাচ্ছে, তুইকেই
আমি প্রণাম করি ;
আমি সে জীবনকে প্রণাম করি যা প্রকাশিত এবং যা সংগুপ্ত ;
আমি সে জীবনকে প্রণাম করি যা অচলের মতো অবরুদ্ধ,
আর অগ্নিমণ্ডলের উৎসারিত ফেনসমুদ্রের জীবনকে প্রণাম করি ;
যে জীবন পদ্মের মতো কোমল, বজ্রের মতো কঠিন।
আমি মনের জীবনকে প্রণাম করি, তাব এক দিক অন্ধকারে,
অপর দিক আলোকে।
আমি তাকেই প্রণাম করি যে জীবন ঘরে এবং যে জীবন
বাহিরের অজ্ঞাতলোকে,
যে জীবন আনন্দপূর্ণ, যে জীবন যন্ত্রণায় কাতর,
যে জীবন চিরচলমান, নৈঃশব্দ্যলোকে জগৎকে যা ঠেলছে,
যে জীবন গভীর ও শান্ত, যা তরঙ্গবিক্ষোভে ভেঙে পড়ে।

জীবন সম্পর্কে এই ধারণা মামুলি তর্কসিদ্ধান্ত নয়। প্রতিবার ডানা-ঝাপ্‌টানি দ্বারা পাখি যেমন বাতাসকে অনুভব করে, এই

ধারণা এই মহিলা-কবির কাছে তেমনি বাস্তব উপলব্ধি। নারী তার সন্তানের মধ্যে জীবনের রহস্যকে পুরুষের চেয়ে বেশি অন্তরঙ্গভাবে উপলব্ধি করে। কবির মধ্যে নারীর এই প্রকৃতি সমস্ত বিশ্বে জীবনের গভীর আলোড়নকে উপলব্ধি করেছে। তিনি তাকে অনন্ত বলে জেনেছেন— এই জানা কোনো যুক্তির পথে নয়, তাঁর উপলব্ধির আলোকে। তাই, যার বাস্তবের উপলব্ধি সীমাবদ্ধ তার কাছে একই ভাব নিতান্ত বিমূর্তরূপে দেখা দেয়; আর যার অনুভূতিশক্তি ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রসারিত তার উপলব্ধির আলোকে সত্য বলে প্রতিভাত হয়। আমরা প্রায়ই পাশ্চাত্য সমালোচকদের বলতে শুনি যে, ভারতীয় মন দার্শনিক, কেননা, তা অন্তরের পথে উধাও হতে উদ্যত হয়ে আছে। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, ভারতের কাছে অনন্ত নিতান্ত দার্শনিক জল্পনার বিষয় নয়; তা তার কাছে সূর্যালোকের মতোই সত্য। ভারত তাকে অবশ্যই দেখে, উপলব্ধি করে, জীবনে তাকে ব্যবহার করে। সে কারণেই অনন্ত তার দেবার্চনার প্রতীকতার মধ্যে ও সাহিত্যে বার বার এসেছে। উপনিষদের কবি বলেছেন, যদি আকাশ অনন্ত আনন্দে পরিপূর্ণ না থাকত তবে জীবনের সামান্যতম গতি অসম্ভব হত। পায়ের তলায় মাটি যেমন বাস্তব, তাঁর কাছে এই বিশ্বগত উপস্থিতি তেমনই বাস্তব, বরং তার চেয়েও বেশি। পঞ্চদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এমন এক ভারতীয় কবির কাছে এই উপলব্ধি সংগীতের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে—

জীবন ও মৃত্যুর ছন্দস্পন্দন সেখানে ধ্বনিত হচ্ছে :
আনন্দের উৎস উন্মুক্ত হয়েছে, আর সকল বিশ্ব আলোকে
উজ্জ্বল হয়েছে।

সেখানে অনাহত সংগীত ধ্বনিত হয়েছে ; এ সেই
ত্রিভুবনের প্রেমগীতি।
সেখানে কোটি সূর্যচন্দ্রের দীপাবলী শোভা পাচ্ছে ;
সেখানে ডমরু-ধ্বনি হচ্ছে, আর প্রেমিক অলস খেলায় মেতেছে।
সেখানে প্রেমগীতি ধ্বনিত হচ্ছে, ও আলোকধারা বর্ষিত হচ্ছে।

ভারতবর্ষে আমাদের সাহিত্যের বড়ো অংশ ধর্মভিত্তিক, কারণ আমাদের ঈশ্বর দূরের ঈশ্বর ন'ন ; তিনি যেমন আমাদের ঘরে আছেন, তেমনই মন্দিরে আছেন। ভালোবাসা ও স্নেহের সকল মানবিক সম্পর্কের মধ্যে আমরা তাঁর নৈকট্য অনুভব করি এবং আমাদের উৎসব সমারোহে তিনিই প্রধান অতিথি, আমরা তাঁকেই সম্মান করি। তাঁর পোশাকের প্রান্তভাগ দেখতে পাই এবং তাঁর পদধ্বনি শুনতে পাই। আমাদের অর্চনার সকল সত্য বস্তুর মধ্যে আমরা তাঁকেই অর্চনা করি এবং যেখানে আমাদের ভালোবাসা সত্য সেখানে আমরা তাঁকেই ভালোবাসি। যে রমণী ভালো, তার মধ্যে আমরা তাঁকেই উপলব্ধি করি ; যে পুরুষ সত্য, তার মধ্যে আমরা তাঁকে জানি ; আমাদের সন্তানদের মধ্যে তিনি চিরশিশুরূপে বার বার জন্মগ্রহণ করেন। সেই কারণে ধর্মসংগীত আমাদের প্রেমসংগীত ; এবং আমাদের পারিবারিক অনুষ্ঠানসমূহ— যেমন পুত্রের জন্ম, বা স্বামিগৃহ থেকে পিতৃগৃহে কন্যার আগমন এবং পুনরায় প্রত্যাবর্তন— সবই আমাদের সাহিত্যে ঈশ্বরলীলার অংশরূপে গাঁথা আছে।

এইভাবে সাহিত্যের রাজ্য সেই ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়ে গেছে যা রহস্যের গভীরে লুকানো ছিল, এবং তাকে মানবিক ও মুখর করে তুলেছে। সত্যের রাজ্যে মানবিক ব্যক্তিত্বের জয়ের সঙ্গে তাল রেখে এই অধিকার বেড়ে চলেছে। এই অধিকার কেবল

ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয় নি, উপরন্তু আমাদের বর্ধিত সহানুভূতির ফলে আমাদের সামাজিক চেতনার ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে। প্রাচীন কালের চিরায়ত সাহিত্য কেবল ঋষি, রাজা ও বীরনায়কে পূর্ণ। যারা অন্ধকারে ভালোবেসেছে ও দুঃখ পেয়েছে, তাদের উপর এই সাহিত্য কোনো আলো ফেলে নি। কিন্তু মানুষের ব্যক্তিত্ব বিস্তৃততর ক্ষেত্রে আলো ফেলেছে, অন্ধকার কোণগুলিতে প্রবেশ করেছে, তার ফলে আর্টের জগতও তার সীমান্ত লঙ্ঘন করেছে এবং অনাবিষ্কৃত অঞ্চলে তার সীমারেখা বাড়িয়ে নিয়ে গেছে। যে-সব ক্ষেত্র স্বরহীন ও রঙছুট্ ঊষর ভূমি হয়ে পড়েছিল, সেখানে আর্ট সৌন্দর্যের প্রতীক সৃষ্টি করেছে এবং এইভাবে জগতের উপর মানুষের জয় ঘোষণা করেছে। আর্ট মানুষকে দিয়েছে তার পতাকা। এই পতাকাতলে সে যুদ্ধযাত্রা করেছে বুদ্ধিহীন ও নিষ্ক্রিয়ের বিরুদ্ধে, ঈশ্বরের সৃষ্টিক্ষেত্রে নিকটে ও দূরে তার বেঁচে থাকার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এমন-কি, মরুভূমির আত্মার সঙ্গে মানব-আত্মার সম্পর্ক আবিষ্কার করেছে। সেখানে প্রকৃতির নৈঃশব্দ্যের সঙ্গে মানব-আত্মার নৈঃশব্দ্যের মিলনের স্মরণস্তম্ভরূপে নিঃসঙ্গ পিরামিডগুলি দাঁড়িয়ে আছে। গুহাগুলির অন্ধকার মানব-হৃদয়ের কাছে তার নীরবতা সমর্পণ করেছে, এবং তার পরিবর্তে গোপনে শিল্পমালায় ভূষিত হয়েছে। গ্রামে ও লোক-বহুল নগরে, মন্দিরে মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি এ কথাই ঘোষণা করেছে, মানুষের কাছে অনন্ত নিতান্ত শূন্য নয়। মানুষের ব্যক্তিত্বের এই অধিকার-বিস্তৃতি সীমাহীন। একালের বাজার ও কারখানা, এমন-কি যেখানে মানুষের সন্তানেরা বন্দী হয়ে আছে সেই-সব বিদ্যালয় ও অপরাধীদের আবাসস্থল কারাগারসমূহ আর্টের স্পর্শে কোমল হয়ে যায় এবং জীবনের সঙ্গে তাদের কঠিন বিরোধ-সম্পর্ক

হারিয়ে ফেলে। কারণ মানুষের ব্যক্তিত্বের একটি প্রয়াস হল—যার সঙ্গে তার কোনো সত্য সম্বন্ধ আছে তাকে সে মানবিক ক্ষেত্রে পরিবর্তিত করে ফেলা। আর্ট উদ্ভিদেব বিস্তারের মতো, মানুষ মরুভূমির কতটা উদ্ধার করে নিজের কবতে পেরেছে তা-ই এর দ্বারা বোঝা যায়।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে যেখানেই জগতের সঙ্গে আমাদের হৃদয়-সম্পর্কে অতিরিক্ত উপাদান আছে, সেখানেই আর্টেব জন্ম। অন্য কথায়, যেখানে আমাদের ব্যক্তিত্ব তার সম্পদকে অনুভব করে, সেখানেই তা বাঁধ ভেঙে আত্মপ্রকাশ করে। যা আমরা নিজেদেব জন্য ভোগ করি, তা সম্পূর্ণরূপে খরচ হয়ে যায়। যা আমাদের প্রয়োজনকে ছাপিয়ে ওঠে তাই ব্যক্ত হয়। বিশুদ্ধ উপযোগিতার স্তর কালো উত্তাপের অবস্থার মতো। তা যখন নিজেকে অতিক্রম করে যায়, তখন শাদা উত্তাপে পরিণত হয়, এবং তখনই সে নিজেকে ব্যক্ত করে।

উদাহরণস্বরূপ আহারে আমাদের উল্লাসকে গ্রহণ করা যাক। এটি শীঘ্রই শেষ হয়ে যায়। অনন্তের কোনো ইঙ্গিত তা দেয় না। সুতরাং যদিও বিস্তৃতির ক্ষেত্রে এই উল্লাস অন্য যে কোনো প্রবৃত্তি অপেক্ষা সর্বজনীনতর, তথাপি আর্ট একে বর্জন করেছে। আটলান্টিক মহাসাগরের এই উপকূলে যে বিদেশী এসেছে অথচ নগদ অর্থের সঙ্গতি দেখাতে পারছে না, তারই মতো এই উল্লাস।

আমাদের জীবনে একটি দিক আছে যা সান্ত, যেখানে প্রতি পদেই আমরা নিজেদের ব্যয় করি। আমাদের অপর একটি দিক আছে যেখানে আমাদের আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ ও ত্যাগ অন্তহীন। মানুষের এই অনন্তের দিকটি অবশ্যই এমন-কিছু প্রতীকের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে যেখানে অমরতার উপাদান আছে।

সেখানে তা স্বভাবতই পূর্ণতা অন্বেষণ করে। সেই কারণে সে যা সামান্য, দুর্বল ও অসংগত, সে-সবকে প্রত্যাখ্যান করে। এই অনন্তাকাঙ্ক্ষা আপন বাসের জন্য স্বর্গ রচনা করে; সেখানে কেবল সেই-সব উপাদানই ব্যবহৃত হয় যা পৃথিবীর নশ্বরতাকে অতিক্রম করে গেছে।

মানুষ আলোকের সন্তান। যখনি সে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে উপলব্ধি করে, তখনি মানুষ নিজের অমরতাকে অনুভব করে। আর, যেমনি মানুষ এটি উপলব্ধি করে, তেমনি সে অমরতার রাজ্যকে মানবজীবনের প্রতি ক্ষেত্রে বিস্তারিত করে।

মানুষের সত্য-জগতের এই প্রাসাদ সত্য ও সৌন্দর্যের জাগ্রত জগৎ। একে রচনা করাই আর্টের কাজ।

মানুষ সেখানে সত্য যেখানে সে তার অনন্তকে অনুভব করে; সেখানে সে ঈশ্বর, আর তার মধ্যে ঈশ্বরই সৃজনকর্তা। তাই, তার সত্য উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে সৃজন করে। কারণ সে তার আপন সৃষ্টির মধ্যে সত্যরূপে বাঁচে এবং ঈশ্বরের জগৎ থেকে আপন জগৎকে সৃষ্টি করে। যথার্থই এ তার আপন স্বর্গ, নানা ভাবের পূর্ণ রূপায়ণ, তা দিয়েই সে নিজেকে ঘিরে রাখে। এখানেই তার সন্তানেরা জন্মায়, তারা বাঁচতে ও মরতে শেখে, ভালোবাসতে ও লড়াই করতে শেখে, এখানে তারা জানতে পারে যে যা কেবল দৃশ্যমান তা-ই সত্য নয় এবং যা সঞ্চয় করা হয় তা-ই সম্পদ নয়।

যদি মানুষ তার নিজের হৃদয়ে যে কণ্ঠস্বর জেগে উঠছে তা শুনতে পারে তবে প্রাচীনকালের ভারতীয় ঋষিকণ্ঠে যে বাণী ধ্বনিত হয়েছে, সেই একই বাণী শুনতে পাবে—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ, বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

হ্যাঁ, এই সেই মহান্ পুরুষ, যিনি মানুষের নিজেকে জানিয়েছেন এবং এই বিশ্বজগৎকে তার কাছে গভীর ব্যক্তিগতরূপে রচনা করেছেন। তাই ভারতবর্ষে আমাদের তীর্থস্থানগুলি নদী ও সাগরের সঙ্গমস্থলে, পর্বতশিখরের চিরন্তন তুষারক্ষেত্রে, নির্জন বেলাভূমিতে অবস্থিত। সেখানে অনন্তের কিছু একটা প্রকাশিত হয়েছে এবং আমাদের হৃদয়ের জন্য তার মহৎ বাণী অপেক্ষা করছে। আর সেখানেই মানুষ মূর্তিতে মন্দিরে, শিলাগাত্রে উৎকীর্ণ চিত্রে এই বাণীই রেখে গেছে— শৃণ্বন্তু বিশ্বে, বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং। এই জগতের মামুলি পদার্থে ও রীতিনীতিতে আমরা ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাই না। কিন্তু যেখানে আকাশ নীল, ঘাস সবুজ, যেখানে ফুলে সৌন্দর্য ও ফলে স্বাদুতা আছে, যেখানে কেবল জাতিরক্ষাই শেষ কথা নয়, বরং বেঁচে থাকার আনন্দ ও সহপ্রাণীদের ভালোবাসা আছে, সহানুভূতি ও আত্মত্যাগ আছে, সেখানেই আমাদের কাছে অনন্ত পুরুষের আবির্ভাব ঘটে। সেখানে আমাদের মাথার উপর কেবল তথ্যের শিলাবৃষ্টি হয় না, বরং চিরকালের মধ্য দিয়ে এই জগৎ ও আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কের বাঁধন অনুভব করি। আর এই হল যথার্থ বাস্তব, তা আমাদের তৈরি আপন সত্য, এই সত্যের সঙ্গে সেই মহান্ পুরুষের চিরন্তন সম্বন্ধ রয়েছে। এই জগতেব আত্মা রেখা ও রঙের অন্তহীন ছন্দে, সংগীতে ও গতিতে, ইঙ্গিতে ও মৃদু স্বরে, অপ্রকাশনীয়ের সকল ইশারায় আত্মপ্রকাশের তাড়নায় অস্থির হয়ে উঠেছে ব'লে মনে হয় এবং এই জগতী আত্মা মহান্ পুরুষের আপন সৃষ্টির মধ্যে আত্মপ্রকাশ ঘটাবার জন্য মানব-হৃদয়ের অন্তহীন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংগতি সন্ধান করছে।

এই মহান্ পুরুষের প্রকাশের জন্য ব্যাকুলতা আমাদের সকল

সঞ্চিত সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে উদার করে তোলে। যখন আমরা ধন সঞ্চয় করি, তখন আমাদের প্রতিটি পয়সার হিসাব করতে হয়; আমরা ঠিকমত যুক্তি দেখাই এবং সতর্কভাবে কাজ করি। কিন্তু যখন আমরা আমাদের সম্পদশীলতার পরিচয় দিতে উদ্যত হই, মনে হয় তখন আমরা সীমার সকল বাঁধন অতিক্রম করে যাই। বস্তুতঃপক্ষে, আমরা সম্পদশীলতা বলতে যা বোঝাই, তা সম্পূর্ণ প্রকাশ করার মতো সম্পদ আমাদের কারুরই নেই। যখন কোনো শত্রুর আক্রমণ থেকে আমরা নিজেদের জীবন বাঁচাতে চেষ্টা করি, তখন আমাদের চলাফেরা সম্পর্কে সতর্ক হই। কিন্তু যখন আমরা ব্যক্তিগত শৌর্য প্রকাশের তাড়নায় অস্থির হয়ে উঠি, তখন আমরা স্বেচ্ছায় বিপদের মধ্যে যাই এবং মৃত্যু-আশঙ্কা পর্যন্ত যেতে রাজী থাকি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খরচের বেলায় আমরা সতর্ক থাকি, কিন্তু উৎসবানুষ্ঠানে যখন আমাদের আনন্দ প্রকাশ করি, তখন আমরা বেহিসেবী হয়ে পড়ি, এমন-কি আমাদের সাধ্যের অতিরিক্ত খরচ করতে প্রস্তুত থাকি। কারণ যখন আমরা আমাদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন থাকি, তখন আমরা বাস্তব তথ্যের শাসনকে অগ্রাহ্য করতে প্রস্তুত হই। যার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বিবেচনার সম্পর্ক, তার সঙ্গে ব্যবহারে আমরা সতর্ক থাকি। কিন্তু যাদের আমরা ভালোবাসি তাদের সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের যথেষ্ট বাঁধা-ধরা সতর্কতা থাকে ব'লে মনে করি না। কবি তাঁর প্রিয়তমার সম্পর্কে বলেছেন :

"আমার মনে হয় আমার অস্তিত্বের সূচনা থেকে আমি তোমার সৌন্দর্যের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি, সংখ্যাতীত যুগ ধরে আমার বাহু-বন্ধনের মধ্যে তোমাকে রেখেছি, তথাপি

তা আমার কাছে যথেষ্ট বলে মনে হল না।"

তিনি বলেছেন, "তোমার আঁচলের হাওয়া যদি পাষাণকে স্পর্শ করে তবে তা কোমলতায় গলে যাবে।"

তিনি অনুভব করেছেন যে, তাঁর "নয়ন দুটি তাঁর প্রিয়তমাকে দেখবার জন্য পাখির মতো উড়ে যেতে চায়।"

যুক্তির দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় এগুলি অতিরঞ্জন মাত্র, কিন্তু তথ্যের সীমা-শাসন-মুক্ত হৃদয়ের দিক থেকে দেখলে এদের সত্য বলেই মনে হবে।

ঈশ্বরের সৃষ্টিতে এ কি এক নয়? সেখানে শক্তি ও পদার্থ একই মামুলি তথ্য মাত্র— তাদের নিজস্ব চুলচেরা হিসাব থাকতে পারে এবং তাদের নিখুঁত ভাবে ওজন ও পরিমাপ করা যায়। সৌন্দর্য তথ্য মাত্র নয়; এর জন্য হিসাব দেওয়া যায় না, একে পরিমাপ করা ও ছকে ফেলা যায় না। এই সৌন্দর্য কেবল অভিব্যক্তি মাত্র। তথ্য হ'ল পানপাত্র— তা সৌন্দর্যকে বহন করে। সৌন্দর্যের দ্বারা তথ্যসমূহ আচ্ছন্ন হয়, এই সৌন্দর্য তাদের ছাপিয়ে যায়। এই সৌন্দর্য ইশারায় অন্তহীন, কথায় তা অপরিমিত। তা ব্যক্তিগত, সুতরাং বিজ্ঞানের আয়ত্তের বাইরে। কবির মতো এই সৌন্দর্য গেয়ে ওঠে, "আমার মনে হয় আমার অস্তিত্বের সূচনা থেকে আমি তোমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি, সংখ্যাতীত যুগ ধরে আমার বাহুবন্ধনের মধ্যে তোমাকে রেখেছি, তথাপি তা আমার কাছে যথেষ্ট বলে মনে হল না।"

তাই আমরা দেখি, আমাদের প্রকাশের জগৎ তথ্যের জগতের সঙ্গে ঠিক ঠিক মিলে যায় না, কারণ ব্যক্তিত্ব প্রতি দিকেই তথ্যকে অতিক্রম করে যায়। ব্যক্তিত্ব তার অন্তহীনতা সম্পর্কে সচেতন এবং প্রাচুর্য থেকে তা সৃজন করে। যেহেতু আর্টের ক্ষেত্রে অমর

পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সব জিনিসের বিচার হয়, সে কারণে আর্টের বেদীতে উপস্থিত করলে আমাদের বাঁধাধরা জীবনে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা অবাস্তব হয়ে পড়ে। কোনো এক বাণিজ্য-প্রভুর পারিবারিক জীবনের কোনো ঘটনার বিবরণ যদি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তবে তা সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে; তথাপি মহৎ শিল্পকীর্তির পাশে রাখলে তার সকল তাৎপর্য নষ্ট হয়ে যাবে। আমরা বেশ অনুমান করতে পারি যদি কোনো নিষ্ঠুর ঘটনাচক্রে এই ব্যাপারটিকে কীটসের "ওড্ অন্ এ গ্রীসিয়ান আর্ণ্" কবিতার পাশে দেখা যায়, তবে তা লজ্জায় মুখ ঢাকবে।

তথাপি এই একই ঘটনাকে যদি তার প্রথাগত অগভীরতা-বর্জিত রূপে গভীরভাবে উপস্থিত করা হয়, তবে চীনদেশের জন্য বড়ো ঋণ সংগ্রহের আলোচনা বা তুর্কীতে বৃটিশ কূটনীতির পরাজয় অপেক্ষা আর্টের ক্ষেত্রে তার দাবী আরও জোরালো হতে পারে। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ঈর্ষার মতো নিতান্ত মামুলি পারিবারিক ঘটনা শেক্স্পীয়ারের ট্রাজেডিতে যেভাবে অঙ্কিত হয়েছে, তা মনুর বিধানে জাতিগত বিধিনিষেধ বা জগতের এক অংশের মানুষ কর্তৃক অপর অংশের মানুষের প্রতি মানবিক ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ-আইন অপেক্ষা আর্টের ক্ষেত্রে অধিকতর মূল্যবান বলে বিবেচিত হতে পারে। কারণ ঘটনার জগতে কার্যপরম্পরাসূত্রে গ্রথিত ঘটনাসমূহ যখন নিতান্ত ঘটনারূপেই বিবেচিত হয়, তখন আর্টের দ্বারা তা প্রত্যাখ্যাত হয়।

কিন্তু আমি যে-সব আইন-কানুনের উল্লেখ করেছি, সেগুলি যখন কোনো ব্যক্তিগত মানুষের প্রতি তাদের অবিচার, অপমান ও যন্ত্রণাসমেত প্রযুক্ত হয় ও সেভাবে দেখা হয়, তখন তারা তাদের পূর্ণ সত্যে দেখা দেয় এবং তারা আর্টের বিষয়ীভূত হয়। একটা

বড়ো যুদ্ধের বিবরণ বড়ো ঘটনা হতে পারে, কিন্তু আর্টের ক্ষেত্রে তা অপ্রয়োজনীয় হতে পারে। কিন্তু যুদ্ধ যেখানে এক স্বতন্ত্র সৈনিকের জীবনে গুরুতর পরিণতির কারণ হয়, তাকে তার প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ও জীবনের মতো পঙ্গু করে দেয়, সেখানে এর জীবন আর্টের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, কেননা আর্টের কারবার বাস্তবকে নিয়ে।

মানুষের সামাজিক জীবন নীহারিকাপুঞ্জের মতো, প্রধানতঃ বিমূর্তভাবের কুয়াশার সমন্বয়ে গঠিত ; তাদের নাম দেওয়া হয়েছে— সমাজ, রাষ্ট্র, জাতি, বাণিজ্য, রাজনীতি ও যুদ্ধ। তাদের গভীর নিরাকারে মানুষ আচ্ছন্ন হয়ে আছে এবং সত্য মুছে গেছে। যুদ্ধ সম্পর্কে একটি অস্পষ্ট ধারণা আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে বহুল দুঃখকে ঢেকে দেয়, এবং বাস্তব সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে অস্পষ্ট করে তোলে। জাতি বা নেশনের ধারণা বহু অপরাধক্রিয়ার জন্য দায়ী। যদি এই কুয়াশা এক মুহূর্তের জন্য সরানো যায় তবে তা আতঙ্ক সৃষ্টি করবে। সমাজ-সম্পর্কিত ধারণা দাসত্বের সংখ্যাতীত রূপ সৃষ্টি করেছে— এগুলি আমরা সহ্য করি কেবল এই কারণে যে, ব্যক্তি-মানুষ সম্পর্কে আমাদের চেতনাকে এই ধারণা নিষ্প্রাণ করে দিয়েছে। ধর্মের নামে এমন-সব কর্ম করা হয়েছে যার শাস্তি দিতে হলে নরকের সকল ব্যবস্থা নিঃশেষিত হয়ে যাবে। কারণ নানা মতবাদের দ্বারা ধর্ম অনুভূতিশীল মানবতার বিরাট উপরি-স্তরের উপর বেদনা-উপশমকারী বিস্তারিত পলেস্তারা লাগিয়েছে। মানুষের জগতের সর্বত্র বিমূর্তের চাপে মানবিক বাস্তবতার হত্যাসাধনের ফলে মহান্ পুরুষ যন্ত্রণা পাচ্ছেন। আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে ‘শ্রেণী’র ধারণা বিদ্যালয়ের শিশুদের বাস্তবতাকে আচ্ছন্ন করছে— তারা কেবল ছাত্রে পরিণত হয়, ব্যক্তি

হয়ে ওঠে না। তাই বইয়ের পাতার মধ্যে যেমনভাবে ফুল-দল নিষ্পেষিত হয় তেমনভাবে শ্রেণীর চাপে শিশুদের জীবনগুলি পিষ্ট হতে দেখলে আমাদের মন ক্লিষ্ট হয় না। সরকারী যন্ত্রে আমলাতন্ত্র সাধারণীকরণ নিয়ে ব্যস্ত, তা মানুষ নিয়ে ব্যবহার করে না। আর সে-কারণেই পাইকারী নিষ্ঠুরতায় প্রবৃত্ত হতে এর কিছুমাত্র বাধে না। একবার যদি আমরা বৈজ্ঞানিক প্রবাদবাক্য 'যোগ্যতমের উর্ধ্বতন'কে সত্য বলে স্বীকার করি, তবে তা তৎক্ষণাৎ মানবিক ব্যক্তিত্বের সমগ্র জগৎকে বিরক্তিকর বিমূর্ত ভাবের মরুভূমিতে রূপান্তবিত করে ফেলবে, সেখানে জীবনের রহস্যচ্যুত হবার ফলে সকল জিনিস আতঙ্কজনকরূপে সরল বলে প্রতিভাত হবে।

কুহেলিকার এই বৃহৎ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে আর্ট তার নিজস্ব তারকা সৃষ্টি করছে। সেই-সব তারকা আকৃতিতে স্পষ্ট, কিন্তু ব্যক্তিত্বে সীমাহীন। আর্ট আমাদের ডাক দিয়ে বলেছে, 'অমৃতের পুত্র' এবং আমাদের স্বর্গলোকে বাস করার অধিকার ঘোষণা করেছে।

মানুষের মধ্যে এমন কী আছে যা মৃত্যুর অতিস্পষ্ট তথ্য থাকা সত্ত্বেও নিজের অমরতা দাবী করে? তা তার শরীর বা মানসিক সংগঠন নয়। তা সেই গভীরতর ঐক্য। তার মধ্যে আছে সেই চরম রহস্য, যা মানুষের জগতের কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে আলোক বিকীর্ণ করে। তা তার দেহের মধ্যেই আছে, তথাপি তার দেহকে অতিক্রম ক'রে যায়। তা তার মনের মধ্যেই আছে, তথাপি মনের বাইরে তাব বৃদ্ধি। তা তার বর্তমানকে অধিকার ক'রে আছে, কিন্তু অতীত ও ভবিষ্যতের তটকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। তা হল মানুষের ব্যক্তিত্ব, আপন অফুরান প্রাচুর্য সম্পর্কে সে সচেতন। এই ব্যক্তিত্বের মধ্যে এই বৈপরীত্য রয়েছে যে, তা নিজের অপেক্ষা অনেক বেশি। তার যতটা দেখা যায়, যতটা জানা

যায়, যতটা ব্যবহার করা যায় তার চেয়ে এই ব্যক্তিত্ব অনেক বেশি। আর ব্যক্তি-মানুষের মধ্যে অনন্তের চেতনা এই ব্যক্তিত্বের প্রকাশকে অমর করে তুলতে নিরন্তর প্রয়াস করছে এবং সমগ্র জগৎ আপনার করে নিতে চাইছে। আর্টে আমাদের মধ্যেকার মানুষ মহান্ পুরুষের কাছে তার উত্তর পাঠাচ্ছে, আর তিনি তথ্যের আলোকহীন জগৎকে অতিক্রম করে অন্তহীন সৌন্দর্যের জগতে আমাদের কাছে নিজেকে উদ্‌ঘাটন করছেন।

“দিবস-জননীর কোলে সদ্যোজাত কালো শিশুর মতো রজনীর আবির্ভাব ঘটেছে। লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র শিশুর দোলনার চার দিক ঘিরে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ করছে। নক্ষত্রেরা নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে আছে পাছে শিশু জেগে ওঠে।”

আমি এইভাবে বর্ণনা করে যেতে পারি, কিন্তু বিজ্ঞান আমাকে উপহাস ক’বে এতে বাধা দেয়। নক্ষত্রের দল নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে— আমার এই বিবরণে বিজ্ঞান আপত্তি করে।

কিন্তু তা যদি ভুল হয়, তবে তার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করব না, ঐ-সব নক্ষত্র নিজেরাই ক্ষমা চাইবে। এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে নক্ষত্রেরা নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। এটা সত্য ঘটনা, একে তর্ক করে উড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব।

কিন্তু বিজ্ঞান অবশ্যই তর্ক করবে, এটা তাব স্বভাব। সে বলে, “যখন তুমি ভাব যে নক্ষত্রেবা নিশ্চল, তখন প্রমাণ হয় তাদের থেকে তুমি অনেক দূবে আছ।”

আমার উত্তর তৈরি আছে— “যখন তুমি বল যে নক্ষত্রেরা ছুটে বেড়াচ্ছে, তখন প্রমাণ হয় তুমি তাদেব খুব কাছে আছ।”

বিজ্ঞান আমার ঔদ্ধত্যে বিস্মিত হয়।

কিন্তু আমি জেদেব সঙ্গে আমার যুক্তি আঁকড়ে থাকব এবং বলব যে, যদি বিজ্ঞানের নিকটেব পক্ষাবলম্বন করার এবং দূরের প্রতি বিরূপ হবার স্বাধীনতা থাকে, তবে সে আমাকে দোষ দিতে পারবে না যদি আমি বিপরীত পক্ষ অবলম্বন করি এবং নিকটের সত্যনিষ্ঠা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করি।

বিজ্ঞান খুব জোর দিযে মত প্রকাশ করে যে কাছের দৃষ্টি সব

চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য দৃষ্টি।

কিন্তু তার মতামতের মধ্যে সংগতি আছে কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হয়। কারণ যখন আমি নিঃসংশয় যে আমার পায়ের তলায় পৃথিবী সমতল, বিজ্ঞান আমাকে এই বলে সংশোধন করে যে কাছের দৃষ্টি সঠিক দৃষ্টি নয় এবং সম্পূর্ণ সত্যকে পেতে হলে তাকে দূরে থেকে দেখা আবশ্যক।

আমি তার সঙ্গে এক মত হতে রাজী আছি। কারণ আমরা কি এ কথা জানি না যে, আমাদের খুব কাছের দৃষ্টি আত্মশ্লাঘী দৃষ্টি, এ দৃষ্টি সমতলের বিচ্ছিন্ন দৃষ্টি? কিন্তু যখন অপরের মধ্যে আমরা নিজেদের দেখি, তখন কি আমরা প্রত্যক্ষ করি না যে আমাদের চাব দিকে ঘিরে যে সত্য, তা বৃত্তাকার ও ক্রমপ্রকাশ-মান?

কিন্তু যদি দূরত্বের সামগ্রিকতার প্রতি বিজ্ঞানের বিশ্বাস থাকেই তবে নক্ষত্রদের চাঞ্চল্য সম্পর্কে তার যে কুসংস্কার আছে, তা তাকে অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। আমরা পৃথিবীর সন্তানেরা রাত্রির বিদ্যালয়-সভায় যোগ দিয়ে জগতের সামগ্রিক রূপের ক্ষণদৃষ্টি লাভ করি। আমাদের মহান ঋষি জানেন যে, বিশ্ব-জগতের সামগ্রিক দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিতে মধ্য-দিনের সূর্যের দৃশ্যের মতোই আতঙ্ককর। আমরা অবশ্যই ধোঁয়াটে কাঁচের মধ্য দিয়ে একে দেখব। করুণাময়ী প্রকৃতি আমাদের চোখের সামনে রাত্রি ও দূরত্বের ধোঁয়াটে কাঁচটি ধরেছেন। এর মধ্য দিয়ে আমরা কি দেখি? আমরা দেখি, নক্ষত্রসভা নিশ্চল। কারণ আমরা এই নক্ষত্রদের পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে দেখি, এবং আমাদের কাছে নক্ষত্রেরা কোনো এক নৈঃশব্দ্যের দেবতার গলায় ঝোলানো হীরকের মালার মতো মনে হয়। কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যা কৌতূহলী

শিশুর মতো এই মালা থেকে একটি নক্ষত্রকে চয়ন করে নেয় এবং তখন আমরা একে ধাবমান অবস্থায় দেখি।

কাকে বিশ্বাস করি তা ঠিক করাই মুশকিল। নক্ষত্রসভার প্রমাণ সরল। আপনাকে কেবল চোখ তুলতে হবে, তাদের মুখে তাকাতে হবে এবং তাদের বিশ্বাস করতে হবে। নক্ষত্রেরা আপনার সামনে বিস্তারিত যুক্তিজাল বিস্তার করে না, এবং আমার মনে হয়, তা-ই বিশ্বাসযোগ্যতার নিশ্চিত প্রমাণ। যদি আপনি তাদের বিশ্বাস করতে রাজী না হন তবে নক্ষত্রদের হৃদয় তাতে ভেঙে যায় না। কিন্তু যখন বিশ্বরঙ্গমঞ্চ থেকে এই-সব নক্ষত্রেব কোনো একটি আলাদাভাবে নেমে আসে এবং চুপিচুপি গণিতের কানে তার সব খবর দেয়, তখন সমগ্র ব্যাপাবটি আলাদা হয়ে দাঁড়ায়।

তাই আজ আমাদের সাহসের সঙ্গে ঘোষণা করতে হবে যে নক্ষত্রদের সম্পর্কে উভয় তথ্যই সত্য। আমাদের বলতে হবে, দূরের পটে নক্ষত্রেবা নিশ্চল এবং নিকটের সমতলে তারা চলমান। আমাব কাছে নক্ষত্রেরা এক সম্পর্কে সত্যি নিশ্চল এবং অন্য সম্পর্কে সত্যি চলমান। দূব ও নিকট দুই ভিন্ন ঘটনা-শ্রেণীর রক্ষক, কিন্তু তা'রা উভয়েই একই সত্যের অন্তর্ভুক্ত— এই সত্যই তাদের প্রভু। সেই কারণে যখন আমরা এক পক্ষকে ভর্ৎসনা কবাব জন্য অপর পক্ষ অবলম্বন কবি তখন যে সত্য উভয়কেই ধরে আছে তাকে আঘাত করি।

ঈশোপনিষদের ভারতীয় ঋষি এই সত্য সম্পর্কে বলেছেন—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।

এর অর্থ এই, যখন আমরা সত্যকে নিকটের অংশে অনুভব করি, তখন সত্যকে চলমানরূপে দেখি ; যখন আমরা সত্যকে

সমগ্ররূপে দেখি— যা দূর থেকে দেখা— তখন তা নিশ্চল থাকে। যেমন আমরা একটি গ্রন্থকে যখন অধ্যায়ে অধ্যায়ে পড়ি তখন তা চলমান। কিন্তু যখন আমরা সম্পূর্ণ গ্রন্থটিকে জানি, তখন সকল অধ্যায়কে আন্তর সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ করে গ্রন্থটি নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে— এইরূপেই দেখি।

এই একটি ক্ষেত্র যেখানে অস্তিত্বের রহস্যে সকল বিরোধের মিলন ঘটে ; এখানে গতি সবটাই গতি নয় ও নিশ্চলতা সবটাই নিশ্চলতা নয় ; এখানে ভাব ও রূপ, অন্তর ও বাহির, মিলিত হয় ; এখানে অসীমতা না হারিয়ে অসীম সীমায় পরিণত হয়। যদি এই মিলন ভেঙে যায়, তখন সকল বস্তুই অবাস্তব হয়ে পড়ে।

যখন অণুবীক্ষণের সাহায্যে আমি একটি গোলাপের পাপড়িকে দেখি, তখন আমি সাধারণভাবে তা যতটা স্থান অধিকার করে তার চেয়ে বিস্তারিত ক্ষেত্রে তাকে দেখি। আমি যত বেশি ক্ষেত্র বিস্তারিত করি, তা ততই অস্পষ্ট হতে থাকে। সুতরাং শুদ্ধ অনন্তে তা গোলাপের পাপড়ি নয়, অন্য কিছুও নয়। একটি বিশেষ ক্ষেত্রে অসীম যেখানে সীমাব মধ্যে ধরা দেয়, সেখানে তা কেবল একটি গোলাপের পাপড়িতে পরিণত হয়। যখন আমরা এই ক্ষেত্র বিনষ্ট করি তখন গোলাপের পাপড়িটি অবাস্তব হতে শুরু করে।

কালের ক্ষেত্রে একই ব্যাপার। যদি কোনো যাদুবিদ্যার দ্বারা গোলাপের পাপড়ির প্রসঙ্গে কালের গতি বাড়িয়ে দিয়ে, ধরা যাক, মাসকে মিনিটে সংহত করে আমি আমার স্বাভাবিক কালক্ষেত্রে থাকতে পারি, তবে তার প্রথম আবির্ভাবের মুহূর্ত থেকে শেষ অন্তর্ধানের মুহূর্ত পর্যন্ত এই ফুল এত দ্রুত-গতিতে ছুটে যাবে যে আমি তাকে দেখতেই পাব না। লোকে এ কথা

নিশ্চিত ভাবতে পারে যে এই জগতে এমন-সব বস্তু আছে যা অন্যান্য প্রাণীর দ্বারা পরিচিত, কিন্তু তাদের কালের সঙ্গে আমাদের কালের মিলন হয় নি বলেই তারা আমাদের কাছে কিছু না। একটি সারমেয় যখন গন্ধ শুঁকে কোনো কিছু অনুভব করে তখন তা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রামের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে না, সেইজন্য তা আমাদের জগতের বাইরে।

একটি উদাহরণ দিই। আমরা এমন-সব অসাধারণ গণিত-পণ্ডিতের কথা শুনেছি যাঁরা অবিশ্বাস্য কম সময়ের মধ্যে কঠিন অঙ্ক কষে দিতে পারেন। গাণিতিক হিসাবের ক্ষেত্রে তাঁদের মন সময়ের একটি ভিন্ন স্তরে কাজ করে। এই স্তর কেবল আমাদের স্তর থেকে ভিন্নতর নয়, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁদেরই স্তর থেকে ভিন্ন। মনে হয় যেন তাঁদের মনের গাণিতিক অংশটি ধূমকেতুর মধ্যে বাস করে, আর অন্যান্য অংশ এই পৃথিবীর অধিবাসী। সুতরাং যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাঁদের মন ঊর্ধ্বশ্বাসে ফলাফলের দিকে ছুটে চলে, তা আমাদের কাছে অদৃশ্য, তা তাঁদের কাছেও দৃষ্ট নয়।

এটা সুপরিজ্ঞাত তথ্য যে, আমাদের জাগ্রত অবস্থার কাল-পরিমিতির স্তর থেকে প্রায়শই ভিন্নতর স্তরে আমাদের স্বপ্ন সঞ্চরণ করে। স্বপ্নলোকের সূর্যঘড়ির পঞ্চাশ মিনিট আমাদের ঘড়িতে মাত্র পাঁচ মিনিট হতে পারে। যদি আমাদের জাগ্রত সময়ের সুবিধাজনক স্থান থেকে এই-সব স্বপ্নকে লক্ষ্য করতে পারি. তবে দেখব তারা আমাদের সামনে দিয়ে দ্রুতগামী রেলগাড়ির মতো ছুটে যাচ্ছে। অথবা যদি আমাদের দ্রুতধাবমান স্বপ্নের জানালা দিয়ে আমাদের জাগ্রত চেতনার মন্থর জগতকে লক্ষ্য করতে পারি, তবে মনে হবে যে, দ্রুতগতিতে এ জগৎ আমাদের থেকে

দূরে চলে যাচ্ছে। বাস্তবিকপক্ষে আমাদের মনের ভাবনা ছাড়া অপরের মনের সঞ্চরণশীল ভাবনাগুলি যদি আমাদের সামনে দেখা দিত তবে তাদের সম্পর্কে আমাদের ধারণা তাদের থেকে ভিন্নতর হত, তার কারণ হল আমাদের মানসিক সময়ের ভিন্নতা। যদি আমাদের খেয়ালখুশি মতো সময়ের দৃষ্টিকোণকে চালাতে পারতেম, তবে দেখতেম যে, জলপ্রপাত নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে এবং পাইনের অরণ্য একটি সবুজ নায়েগ্রা প্রপাতের মতো দ্রুত ছুটে চলেছে।

স্থতরাং আমরা যা অনুভব করছি জগৎ তা-ই, এ কথা বললে প্রায় সত্য কথাই বলা হয়। আমরা কল্পনা করি, আমাদের মন হল দর্পণ ; আমাদের বাইরে যা ঘটছে তা কম বেশি যথার্থরূপে এই দর্পণেই প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। বিপরীতক্রমে, সৃষ্টির প্রধান উপাদান হল আমাদের মন। যখন আমি জগৎকে অনুভব করছি, তখন দেশ ও কালে আমারই জন্য নিরন্তর জগৎ-সৃষ্টি হচ্ছে।

দেশ ও কালের বিভিন্ন কেন্দ্রে মন বিভিন্ন দৃশ্য দেখার ফলে সৃষ্টির বৈচিত্র্য দেখা দিচ্ছে। যখন মন মহাকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ দেখে— যাকে রূপকচ্ছলে ঘনীভূত নক্ষত্র বলা যায়— তখন তাদের পরস্পর-সম্বন্ধও গতিহীন বলে মনে হয়। যখন মন গ্রহগুলিকে দেখে, তখন আকাশের অনেক কম ঘনত্বে সে এদের দেখে ও তার ফলে গ্রহগুলিকে বিচ্ছিন্ন ও গতিশীল বলে মনে হয়। যদি অতি ভিন্নতর ক্ষেত্রে একটি লৌহদণ্ডের অণুগুলিকে দেখবার দৃষ্টি আমাদের থাকত, তবে তাদের গতিশীলরূপে দেখা যেত। কিন্তু যেহেতু কাল ও মহাকালের নানা ব্যবস্থার মধ্যে আমরা বস্তুগুলিকে দেখি, সেজন্য লোহাকে লোহা বলেই দেখি, জল জল বলেই ও মেঘ মেঘ বলেই আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়।

এটি সুপরিজ্ঞাত তথ্য যে, আমাদের মানসিক দৃষ্টির নানা

বিন্যাসের ফলে বস্তুসমূহ তাদের ধর্ম পরিবর্তন করে বলে মনে হয়, এবং আমোদজনক বিষয় আমাদের কাছে বেদনাদায়ক বলে প্রতিভাত হয় এবং তার বিপরীতও ঘটে। মনের এক বিশেষ তুরীয় অবস্থায় মানুষ আনন্দলাভের জন্য ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করে। চরম আত্মোৎসর্গের উদাহরণ আমাদের কাছে অতিমানবিক বলে মনে হয়, কারণ যে মানসিক অবস্থার প্রভাবে ঐ কাজ সম্ভব হয়, এমন-কি বাঞ্ছিত বলে মনে হয়, তা আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে নেই। ভারতবর্ষে আগুনের উপর হেঁটে যাবার দৃশ্য অনেকেই দেখেছেন, যদিও বিজ্ঞানসম্মতভাবে সেগুলির অনুসন্ধান করা হয় নি। বিশ্বাসের দ্বারা নিরাময়ের ক্ষমতার ক্রম সম্পর্কে মতভেদ থাকতে পারে, তথাপি এই বিশ্বাস বস্তুর উপরে মনের প্রভাবের পরিচয়স্থল, কিন্তু ইতিহাসের সূচনা-পর্ব থেকে এর সত্যতা মানুষে স্বীকার করেছে ও তদনুযায়ী কাজ করে এসেছে। আমাদের নীতিশিক্ষার নানা প্রণালী এই বাস্তব ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, আমাদের মানসিক কেন্দ্রভূমি ও পরিপ্রেক্ষিত পরিবর্তনের দ্বারা সমগ্র জগৎকে পরিবর্তিত করা যায় ও পরিবর্তিত মূল্যমানের বস্তুনিচয়ের মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভিন্ন সৃষ্টি করা যায়। সুতরাং মানুষ যখন খল তখন তার কাছে যা মূল্যবান বলে মনে হয়, যখন সে ভালো তখন তার কাছে সেটা মূল্যহীন অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বলে মনে হয়।

ওআল্ট হুইট্‌ম্যান তাঁর কবিতায় তাঁর মানসিক অবস্থানের পরিবর্তন গভীর নৈপুণ্যের সঙ্গে দেখিয়েছেন এবং এইভাবে অন্যান্য মানুষের জগৎ থেকে নিজের জগৎকে পরিবর্তিত করেছেন, নানা বিষয়ের অর্থ বিভিন্ন অনুপাতে ও রূপে পুনর্বিন্যস্ত করেছেন। যে-সব বস্তুর প্রথাসিদ্ধ দৃঢ়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে

মনের এই ধরণের চলিষ্ণুতা ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায়। সে কারণেই তিনি তাঁর একটি কবিতায় বলেছেন—

আমি শুনেছি যে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে
আমি নাকি প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস করতে চেয়েছি ;
কিন্তু সত্যি আমি এদের না পক্ষে, না বিপক্ষে ;
এদের সঙ্গে আমার কিসেই বা মিল আছে ?—
আর এদের ধ্বংসের সঙ্গে আমার কি যোগ আছে ?—
আমি কেবল মানহাট্টা ও এই-সব রাষ্ট্রের প্রতি নগরীতে,
দেশের অভ্যন্তরে ও সমুদ্রতটে,
এবং শস্যক্ষেত্র ও অরণ্যভূমিতে, ছোটো ও বড়ো
জলজাহাজের উপরে,
অট্টালিকা, আইন-কানুন, অছি বা কোনো যুক্তি ছাড়াই
এই সহকর্মীদের ভালোবাসার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করব।

যে-সব প্রতিষ্ঠান দৃঢ়ভাবে নির্মিত হয়েছে, খুব নিরেট ও স্থূল হয়েছে, কবির জগতে তা বাষ্পেব মতো উবে যায়। এ যেন রঞ্জনরশ্মির জগৎ যেখানে জগতের নিরেট বস্তুর কোনো অস্তিত্বই নেই। অপরপক্ষে, বন্ধুদের ভালোবাসা সাধারণ জগতে যা তরল পদার্থ, যা মেঘের মতো আকাশে ভেসে বেড়ায় ও পথের কোনো চিহ্ন না রেখেই চলে যায়, তা কবির জগতে সকল প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা বেশি স্থায়ী। এখানে তিনি এমন এক কালে বস্তুনিচয়কে দেখেন যেখানে পর্বতমালা ছায়ার মতো চলে যায়, কিন্তু আপাত-ক্ষণভঙ্গুরতা সত্ত্বেও বর্ষার মেঘমালা চিরন্তন রূপে বিরাজ করে। তিনি তাঁর জগতে অনুভব করেন যে, বন্ধুদের ভালোবাসা কঠিন-ভিত্তিহীন মেঘমালার মতো নিরেট ও সত্য, এবং তা কোনো প্রাসাদ, আইন, অছি বা যুক্তি ছাড়াই স্থাপিত হতে পারে।

যখন ওআল্ট হুইটম্যানের মতো ব্যক্তির মন অন্যদের অপেক্ষা ভিন্নতর সময়ে সঞ্চরণ করে, তখন তাঁর জগৎ স্থানচ্যুতির ফলে ধ্বংস হয়ে যায় না, কারণ তাঁর জগতের কেন্দ্রস্থলে তাঁর আপন ব্যক্তিত্ব বিরাজমান। এই জগতের সকল ঘটনা ও আকৃতি এই কেন্দ্রীয় সৃজনী ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত। সেইজন্য তারা স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবেই পরস্পর-সম্পর্কিত। তাঁর জগৎ নক্ষত্রদলের মাঝে ধূমকেতুর মতো হতে পারে, অন্যান্যদের অপেক্ষা চলাফেরায় ভিন্নতর হতে পারে, কিন্তু এই কেন্দ্রীয় ব্যক্তিক ক্ষমতার জন্যে এর নিজস্ব সঙ্গতি থাকে। এ জগৎ সাহসিক জগৎ বা পাগলেব জগৎ হতে পাবে। এর বিরাট কক্ষপথে খেয়ালি পুচ্ছতাড়নায় বিভ্রান্ত হতে পাবে, তথাপি এ এক জগৎ বটে।

কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ভিন্নতর। কারণ বিজ্ঞান এই জগতের সম্পর্ক থেকে ঐ কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বকে একেবারেই বর্জন করার চেষ্টা কবে। বিজ্ঞান দেশ ও কালের এক ব্যক্তিবর্জিত ও অপরিবর্তনশীল নিরিখ স্থাপনা করে। তা সৃষ্টির নিরিখ নয়। সেইজন্য এব চরম স্পর্শে বাস্তবতার জগৎ এত বেশি বিচলিত হয় যে এক অমূর্তক্ষেত্রে তা অদৃশ্য হয়ে যায়, সেখানে বস্তুনিচয় শূন্যতায় পর্যবসিত হয়। কারণ জগৎ পরমাণুসমষ্টি ও অণুপুঞ্জ নয়, অথবা বৈদ্যুতীসঞ্চারণ বা অন্যান্য শক্তিমাত্র নয়; হীরক অঙ্গারমাত্রও নয়, এবং আলোক ঈথারতরঙ্গকম্পনমাত্র নয়। ধ্বংসেব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচাব করলে আপনারা কখনোই সৃষ্টির বাস্তবতায় উপনীত হতে পারবেন না। কেবল এই জগৎ নয়, স্বয়ং ঈশ্বব বিজ্ঞানেব দ্বারা বাস্তবতা-বিচ্যুত হয়েছেন; আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কেব বাইরে যুক্তির পরীক্ষাগারে বিজ্ঞান ঈশ্বরকে বিশ্লেষণ করতে চাইছে, এবং তার পর অজানা ও অজ্ঞেয় বলে ঈশ্বরকে বর্ণনা

করছে। ঈশ্বরকে যে জানতে পারে ও জানে, তার বিবরণ যখন আমরা একেবারেই বাদ দিই, তখন ঈশ্বরকে অজ্ঞেয় বলা নিতান্ত পুনরুক্তি মাত্র। আহারকারীর অনুপস্থিতিতে খাদ্য আহারযোগ্য নয় বলার মতোই এই উক্তি। শুকনো নীতিবাদীরা আমাদের হৃদয়ের বাঞ্ছিত বিষয় থেকে আমাদের সরিয়ে নেবার জন্য এই একই কৌশল অবলম্বন করেন। যে জগতে নৈতিক ভাবগুলি সৌন্দর্যে স্বাভাবিক স্থান পাবে, আমাদের জন্য সে জগৎ সৃজনের পরিবর্তে তাঁরা আমরা যে অসম্পূর্ণ জগৎ নিজেরা গড়ে তুলেছি, তা ভাঙতে শুরু করেন। তাঁরা মানবিক ব্যক্তিত্বের পরিবর্তে নৈতিক বচন উপস্থিত করেন এবং বস্তুনিচয়ের ধ্বংসের দৃশ্য আমাদের দেখান এবং প্রমাণ করতে চান যে তাদের অবয়বের অন্তরালে বিকট প্রতারণা রয়েছে। কিন্তু যখন আপনি সত্যকে তার অবয়ব-চ্যুত করেন, তখন সে বাস্তবতার শ্রেষ্ঠ অংশ হারায়। কারণ অবয়ব ব্যক্তিগত সম্পর্কের অন্তর্গত ; এ আমারি জন্য। এই বহিঃ-অবয়ব উপরিতলের বলে বোধ হয়, কিন্তু তা অন্তর্গূঢ় আত্মার বাণীবাহক। আপনাদের কবি এর সম্পর্কে বলেছেন—

আমার পর্যবেক্ষণের সূচনার প্রথম ধাপেই
আমি খুব তৃপ্ত হয়েছি,
কেবলমাত্র তথ্য, চেতনা— তার নানা রূপ,— গতির শক্তি,
তুচ্ছ কীট বা পশু-ইন্দ্রিয়-নিচয়-দৃষ্টিশক্তি-ভালোবাসা ;
আমি বলি এই প্রথম ধাপ আমাকে ভীত, বিস্মিত
ও এত মুগ্ধ করেছে যে,
আমি এগোই নি, আরো বেশি এগোতে চাই না,
কেবল থামতে চাই, সারা বেলা ঘুরে বেড়াতে চাই,
আর গান গেয়ে জীবনোল্লাস প্রকাশ করতে চাই।

আমাদের বিজ্ঞানের জগৎ যুক্তির জগৎ। তার নিজস্ব মহত্ত্ব, উপযোগিতা ও আকর্ষণ আছে। তার প্রাপ্য সম্মান দিতে আমরা প্রস্তুত আছি। কিন্তু যখন বিজ্ঞান আমাদের জন্য সত্য জগৎ আবিষ্কারের দাবি করে এবং সকল সরলমনা মানুষের জগৎকে উপহাস করে, তখন আমরা নিশ্চয়ই বলব যে এ যেন এক ক্ষমতা-উন্মত্ত সেনাপতি, যে তার রাজার সিংহাসন অধিকার করতে উদ্যত হয়েছে। কারণ জগতের সত্যতা মানুষের ব্যক্তিত্বে, যুক্তিত্বে নয়; এই যুক্তি-তর্ক যতই প্রয়োজনীয় ও বড়ো হোক না কেন, তা স্বয়ং মানুষ হয়ে উঠতে পারে না।

যদি আমরা সম্পূর্ণরূপে জানতে পারতাম যে বেঠোভেনের মনের মধ্যে একটি সংগীতাংশ কী রূপে আছে, তবে আমরা নিজেরাই অসংখ্য বেঠোভেন হয়ে উঠতাম। কিন্তু যেহেতু আমরা এর রহস্য আয়ত্ত করতে পারি না, সে কারণে বেঠোভেনের সোনাটায় তাঁর ব্যক্তিত্বের উপাদানকে পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে পারি। তত্রাচ আমরা সম্পূর্ণ সচেতন যে আমাদের নিজেদের ব্যক্তিত্বের গভীর তলদেশ স্পর্শ করার ক্ষমতায় তার সত্য মূল্য নিহিত। তবে পিয়ানোতে যখন ঐ সোনাটা বাজানো হয় তখনকার ঘটনার উপর লক্ষ রাখা সহজতর কাজ। আমরা পিয়ানোর চাবিঘরের শাদা ও কালো চাবিগুলি গণনা করতে পারি, তারগুলির পারস্পরিক দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে পারি, অঙ্গুলিচালনার শক্তি, গতি ও পারম্পর্য পরিমাপ করতে পারি, এবং সোল্লাসে ঘোষণা করতে পারি এটি বেঠোভেনের সোনাটা। শুধু তাই নয়, আমাদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী যখন যেখানে এই পরীক্ষা করা হবে তখন সেখানে এই একই সোনাটার সৃষ্টি হবে, এই ভবিষ্যদ্বাণীও করতে পারি। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সোনাটার নিরন্তর পর্যালোচনা করলে

আমরা এ কথা ভুলে যেতে পারি যে এই সোনাটার উৎস ও উদ্দেশ্য মানুষের ব্যক্তিত্বে নিহিত, এবং অঙ্গুলি ও তারের পারস্পরিক ক্রিয়া যতই সঠিক ও শৃঙ্খলাসমন্বিত হোক না কেন, তারা সংগীতের চরম সত্যতাকে আয়ত্ত করতে পারে না।

যখন খেলোয়াড়ে খেলে, তখন খেলাই খেলে। অবশ্য খেলাকে বিশ্লেষণ ও আয়ত্ত করার জন্য খেলার নিয়মকানুন আমাদের পক্ষে আবশ্যকীয়। কিন্তু যদি এ কথা জোর দিয়ে বলা হয় যে, এই নিয়মই এর সত্যতা, তবে আমরা তা গ্রহণ করতে পারি না। কারণ খেলা খেলোয়াড়ের কাছে যা, তা-ই। খেলোয়াড়দের ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী খেলার রূপ পরিবর্তিত হয়। কারুর কাছে খেলা জয়লাভের প্রলোভন মাত্র, অন্য কারুর কাছে প্রশংসালাভের উপায় মাত্র। কেউ-বা এর মধ্যে সময় কাটাবার পন্থা খোঁজে। কেউ-বা তাদের সামাজিক প্রবৃত্তির চরিতার্থ করার উপায়রূপে খেলাকে গ্রহণ করে, আবার কেউ-বা খেলার গোপন রহস্য পর্যবেক্ষণের জন্য নিরাসক্ত কৌতূহলের সঙ্গে একে দেখে। তথাপি এর বহুমুখী রূপের মধ্যে এর আইন একই থাকে। কারণ সত্যতার প্রকৃতি হচ্ছে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। এবং এই জগৎ আমাদের কাছে এই খেলার মতো— আমাদের সকলের কাছে এ একই, আবার এক নয়ও।

বিজ্ঞান এই একত্ব, পরিপ্রেক্ষিতের আইন ও রঙের সমাবেশ নিয়ে আলোচনা করে। ছবি নিয়ে বিজ্ঞান আলোচনা করে না— ছবি হল একটি ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি এবং তার আবেদন দর্শকের ব্যক্তিত্বের কাছে। বিজ্ঞান তার গবেষণাক্ষেত্র থেকে ব্যক্তিত্বের বিলোপ সাধন করে এবং কেবল সৃষ্টির মাধ্যমের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ ক'রে এই কাজ করে।

এই মাধ্যম কি? আত্মপ্রকাশের জন্য অনন্ত সত্তা তাঁর সামনে এই সান্তের মাধ্যমকে স্থাপিত করেন। তাঁর স্বেচ্ছাকৃত শাসন—দেশকালের গণ্ডীর এবং রূপ ও গতির শাসন—তারই প্রতিনিধি এই মাধ্যম। এই আইন হল যুক্তি, তা সর্বজগদ্গত; নিরন্তর সদাপরিবর্তমান রূপের মধ্যে আত্মপ্রকাশমান সৃজনীভাবের অন্তহীন ছন্দকে এই যুক্তি নিয়ন্ত্রিত করে।

আমাদের ব্যক্তিগত মন এই বিশ্বগত মনের ছন্দশীল কম্পনকে তারের মতো আয়ত্তে আনে এবং দেশকালের সংগীতে সাড়া দেয়। আমাদের মনের তারগুলির গুণ, সংখ্যা ও স্বরগ্রাম পরস্পর বিভিন্ন এবং তাদের সুরসাধনা এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণতায় পৌঁছয় নি, কিন্তু তাদের নিয়ম এই বিশ্বগত মনের নিয়ম। আর এই বিশ্বগত মন সেই সীমাযন্ত্র যাতে চিরকালের খেলার রাজা তাঁর সৃষ্টির নৃত্যসংগীত বাজিয়ে চলেছেন।

মন আছে বলে আমাদের যে-সব উপাদান আছে, সেগুলির কারণে আমরা নিজেরাই সৃষ্টিকর্তা হয়ে পড়েছি। আমরা কেবল আর্ট ও সামাজিক সংগঠন গড়ে তুলি না, সেই সঙ্গে আমাদের অন্তরপ্রকৃতি ও বাইরের পরিবেশকেও সৃজন করছি। আর বিশ্বগত মনের আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার উপর এদের সত্যতা নির্ভর করে। অবশ্য আমাদের সৃষ্টি ঈশ্বরের বিরাট বিশ্বসৃষ্টির উপরই নানা বৈচিত্র্য মাত্র। যখনি আমরা কোনো অসঙ্গতি সৃষ্টি করি, তখনি তাকে সঙ্গতিতে সমাপ্ত হতে হবে অথবা নৈঃশব্দ্যে বিলুপ্ত হয়ে যেতে হবে। বিশ্ব-সংগীতির ঐকতানে আমাদের কণ্ঠস্বর মেলাতে পারলেই সৃষ্টিকারীরূপে আমাদের স্বাধীনতা সর্বোচ্চ আনন্দ লাভ করবে।

বিজ্ঞান কবিমানসের সুস্থতা সম্পর্কে সন্দিহান। অসীম সীমার

মাঝে ধরা দেয়— এই আপাত-অসম্ভাব্যকে বিজ্ঞান মানতে রাজী নয়।

আমার বক্তব্যের সমর্থনে আমি কেবল এ কথাই বলতে পারি, এই আপাত-অসম্ভাব্য আমার চেয়ে প্রাচীনতর। অস্তিত্বের মূলে এই আগত-অসম্ভাব্য রয়েছে। এই দেওয়ালটি যেমন বাস্তব, আপাত-অসম্ভাব্য তেমনি বাস্তব তথ্য, এবং সেই সঙ্গে রহস্যময়; তা ব্যাখ্যাতীত বিস্ময়।

ঈশোপনিষদের ঋষির কাছে আমি ফিরে যাই এবং সীমা-অসীমের এই বিরোধিতা সম্পর্কে তাঁব বক্তব্য শুনি। তিনি বলেছেন—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

যাঁরা সীমাজ্ঞানের খাতিরেই তার অনুসরণ করেন, তাঁরা সত্যকে পান না। এ যেন মরা দেয়াল, পিছনের দৃষ্টিকে আড়াল করে। এই জ্ঞান কেবল সঞ্চয় করে, কিন্তু দীপ্তি দেয় না। এ যেন আলোহীন প্রদীপ, সংগীতহীন বেহালা। বইয়ের পাতা মেপে, ওজন করে ও গুনে আপনি বইটিকে জানতে পারেন না, এর কাগজ বিশ্লেষণ করেও না। একটি কৌতূহলী মূষিক পিয়ানোর কাঠের ফ্রেম দংশন করতে পারে, এর সব ক'টি তার কেটে ফেলতে পারে। তথাপি সংগীত থেকে সে ক্রমশঃই দূরে চলে যাবে। এ হল সীমার খাতিরে সীমার অন্বেষণ।

কিন্তু উপনিষদের মতে, অসীমের একান্ত অন্বেষণ আরো গাঢ় অন্ধকারে আমাদের নিয়ে যায়, কেননা পরম অসীম শূন্যতা মাত্র। সীমা হল একটা কিছু; একটা ব্যাঙ্কে জমাহীন হিসেবের চেক-বইয়ের মতো। কিন্তু পরম অসীমের কোনো কিছুই জমা নেই।

এমন-কি চেক-বই পর্যন্ত না। আদিম মানুষ গভীর মানসিক অজ্ঞতায় বিশ্বাস করত যে ব্যক্তিগত খেয়ালের বশে প্রতিটি আপেল মাটিতে পড়ে। কিন্তু তুলনায় আদিম মানুষের অজ্ঞতা কিছুই না বলে মনে হয় যখন জানি এমন মানুষও আছে যে এমন মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের ধ্যানরত যেখানে আপেল বা কোনো কিছুই পড়ে না।

তাই ঈশোপনিষৎ একটি শ্লোকে বলেছেন—

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে॥

গান ও গান গাওয়া যেমন এক, সীমা ও অসীম তেমনি এক। গান গাওয়া ব্যাপারটি অসম্পূর্ণ; সম্পূর্ণ হল গান। গান গাওয়া তার ক্রমান্বয় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গানকে পথ ছেড়ে দেয়। পরম অসীম এমন এক সংগীত যা সকল স্পষ্ট সুর-ছাড়া, আর সে কারণেই অর্থহীন।

পরম অনন্ত হচ্ছে কালহীনতা, আর তার কোনো অর্থই নেই— এ কেবল একটি শব্দ। যেখানে সকল সময় সংহত হয়ে আছে সেখানেই অনন্তের সত্যতা।

সেই কারণে উপনিষৎ বলেছেন—

বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥
অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥

আমরা দেখেছি যে বস্তুসমূহেব আকৃতি ও তাদের পরিবর্তন-সমূহেব একেবারেই কোনো পরম বাস্তবতা নেই। আমাদেব ব্যক্তিত্বে তাদের সত্যের অধিষ্ঠান, আর কেবল সেখানেই তা বাস্তব. বিমূর্ত নয়। আমরা দেখেছি, যদি আমাদের মনের চলাফেরা,

দেশকাল পরিবর্তন করে, তবে একটি পর্বত ও একটি জলপ্রপাত অন্য-কিছু হয়ে যেতে পারে, অথবা আমাদের কাছে কিছুই না বলে মনে হতে পারে।

আমরা আরো দেখেছি, আমাদের এই সম্পর্ক-বন্ধনে আবদ্ধ জগৎ স্বেচ্ছাচারী নয়। এ ব্যক্তিগত, অথচ বিশ্বগত। আমার জগৎ আমারই, এর উপাদান আমার মন, তথাপি আপনার জগৎ নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যক্তিত্বে নিহিত নয়, বরং এক সীমাহীন ব্যক্তিত্বের অধীন।

যখন এই ব্যক্তিত্বের স্থলে আমরা আইনকে বসাই, তখন সমস্ত জগৎ বিমূর্ততায় ভেঙে পড়ে। তখন তা হয়ে পড়ে উপাদান ও শক্তি, আয়ন ও ইলেক্‌ট্রন। তখন তার রূপ নষ্ট হয়, স্পর্শবোধ ও রুচি বিলুপ্ত হয়। তখন সৌন্দর্য-মুখর বিশ্ব-নাটক নীরব হয়, সংগীত নিস্তব্ধ হয়। তখন অন্ধকারে বিশ্বরঙ্গমঞ্চের কলাকৌশল প্রেতে পরিণত হয়, অকল্পনীয় নাস্তিত্বের ছায়া দর্শকহীন প্রেক্ষাগৃহে দেখা দেয়।

এই প্রসঙ্গে আমি আবার আপনাদের দ্রষ্টা-কবি ওআল্ট হুইট্‌-ম্যানের বক্তব্য উদ্ধার করছি—

যখন আমি বিজ্ঞ জ্যোতির্বিদের ভাষণ শুনলাম,
যখন প্রমাণাদি, নানা সংখ্যা আমার সামনে থামের মতো
এসে দাঁড়ালো,
যখন আমাকে নানা আঁকজোক রেখাচিত্র দেখানো হল,
তাদের যোগ, বিভাগ ও পরিমাপ করতে বলা হল,
যখন সভাগৃহে বসে প্রশংসাধ্বনির মধ্যে জ্যোতির্বিদকে
ভাষণ দিতে শুনলাম,
তখন কত সত্বর আমি বিনা কারণে ক্লান্ত ও শ্রান্ত বোধ করলাম,

যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি সেখান থেকে বেরিয়ে চলে এসে
বাইরে ঘুরলাম,
রহস্যময় কুয়াশাভরা নৈশ আকাশতলে ঘুরে বেড়ালাম,
আর মাঝে মাঝে
প্রগাঢ় নৈঃশব্দ্যে নক্ষত্রসভার দিকে তাকালাম।

তারকামণ্ডলীব ছন্দোবিজ্ঞান অধ্যাপন-গৃহে নানা রেখাচিত্র এঁকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, কিন্তু তারকামণ্ডলীর কাব্য পাওয়া যাবে আত্মাব সঙ্গে আত্মার নিঃশব্দ মিলনে, আলো-আঁধারের সংগমস্থলে। সেখানে সীমার ললাটে অসীম তার চুম্বনলেখা অঙ্কিত কবে দেয়। সেখানে শুনতে পাই সৃষ্টির বিশাল বাদ্যযন্ত্রে মহৎ 'অহং'-এর সংগীত সংখ্যাতীত চাবিতে অন্তহীন সঙ্গতিতে বেজে উঠছে। এই জগৎ গতিশীল, তা স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে। "জগৎ"— এই সংস্কৃত শব্দটির অর্থ যা চলছে। এর সকল রূপ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু তা কেবল জগতের নেতিবাচক দিক। তার সমস্ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি সম্পর্কের মালা গাঁথা রয়েছে, তা অনন্ত। একটি গল্পগ্রন্থে বাক্যগুলি ছুটে চলে, কিন্তু গ্রন্থের ইতিবাচক উপাদান হল গল্পের সঙ্গে বাক্যনিচয়ের সম্পর্ক। লেখক-ব্যক্তিত্বের অভিলাষকে এই সম্পর্ক প্রকাশ কবে, এবং পাঠক-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করে। যদি গ্রন্থটি গতিহীন অর্থহীন বিচ্ছিন্ন শব্দের সংগ্রহ মাত্র হত, তবে আমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে এ কথা বলতে পারতাম যে এটি আকস্মিকভাবে রচিত হয়েছে। আর সে ক্ষেত্রে পাঠক-ব্যক্তিত্বের কোনো সাড়া গ্রন্থটি পেত না। সেইভাবে সমস্ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই জগৎ আমাদের কাছে নিতান্ত পলাতক চাতুরী নয়, এর চলাফেবার মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে এই জগৎ অনন্তের কিছুটা প্রকাশ করে।

ভাবপ্রকাশের জন্য রূপ একান্ত আবশ্যকীয়। কিন্তু অসীম ভাব সীমাবদ্ধ রূপের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। সুতরাং রূপ নিয়তই চলবে ও পরিবর্তিত হবে, তা অবশ্যই মৃত্যুহীনকে প্রকাশের জন্য বিনষ্ট হবে। অভিব্যক্তি অবশ্যই স্পষ্ট অভিব্যক্তি হবে, আর তা কেবল এর রূপে ধরা দেয়। কিন্তু একই সঙ্গে অসীমের অভিব্যক্তি রূপে হবে তা সীমাহীন, আর তার রূপ কেবল তার গতিতে পড়বে ধরা। সেই কারণে জগৎ যখন আকৃতি গ্রহণ করে, তখন সে সদাই তার আকৃতিকে অতিক্রম করে যায়। এই জগৎ স্বচ্ছন্দে নিজেকে অতিক্রম করে যায়, আর এ কথাই প্রকাশ করে যে এর অর্থ, জগৎ যা ধারণ করতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশি।

নীতিবাদী বিষাদের সঙ্গে মাথা নাড়ে আর বলে এই জগৎ অহমিকা মাত্র। কিন্তু এই অহমিকা শূন্যতা নয়— এই শূন্যতায় সত্য নিহিত আছে। যদি জগৎ স্থির থাকে ও চূড়ান্ত হয়ে থাকে, তবে যে সত্য অসীম, তার স্বাধীনতা হারিয়ে মাতৃহারা শিশুর মতো নানা তথ্যভরা বন্দীশালারূপে এই জগৎ দেখা দেয়। তাই আধুনিক চিন্তাবিদ্ যে-কথা বলেন তা সত্য এই অর্থে যে গতিতেই সকল বস্তুর অর্থ নিহিত— কারণ কেবল বস্তুনিচয়ের মধ্যেই তাদের অর্থ নিহিত নেই, বরং তারা যেখানে তাদের সীমাকে অতিক্রম করে যায় সেখানেই অর্থ রয়েছে। ঈশোপনিষৎ এ কথাই ইঙ্গিত করেন যখন বলেন যে না ক্ষণস্থায়ী, না অনন্ত— স্বতন্ত্ররূপে কারোর কোনো অর্থ নেই। যখন তারা পরস্পরের মধ্যে সঙ্গতিপূর্ণ রূপে দেখা দেয়, কেবল তখনই সেই সঙ্গতির সাহায্যে আমরা ক্ষণস্থায়ীকে অতিক্রম করি ও অমরকে উপলব্ধি করি।

যেহেতু এই জগৎ সীমাহীন ব্যক্তিত্বের জগৎ, সে কারণে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এই জগতের সঙ্গে

ক্রটিহীন ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন— ঈশোপনিষৎ এই শিক্ষাই দিয়েছেন। তাই ঈশোপনিষদের সূচনা হয়েছে এই শ্লোকে—

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

অর্থাৎ আমাদের জানতে হবে এই জগতের নানা গতি নিতান্ত অন্ধগতি নয়; তারা এক মহান্ পুরুষের ইচ্ছার সঙ্গে সম্পর্কিত। সত্যের নিছক জ্ঞান ক্রটিপূর্ণ, কেননা তা ব্যক্তিগত নয়। কিন্তু আনন্দোপভোগ ব্যক্তিগত, এবং আমার উপভোগের ঈশ্বর চলছেন; তিনি ক্রিয়াশীল; তিনি নিজেকে দান করছেন। এই দানক্রিয়ায় অসীম সীমার রূপ ধারণ করেন, এবং সেজন্য এমনভাবে বাস্তব হয়ে ওঠেন যা'তে তাঁর মধ্যে আমি আমার আনন্দকে পাই।

[আমাদের যুক্তির আধারে প্রতিভাত জগৎ অদৃশ্য হয়ে যায় ও আমরা তাকে বলি মায়া। এ হল নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু আমাদের উপভোগ ইতিবাচক। বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে একটি ফুল কিছুই না, কিন্তু যখন আমরা তা উপভোগ করি তখন ফুল সত্যই ফুল। এই আনন্দ সত্য, কেননা তা ব্যক্তিগত। আর সম্পূর্ণ ক্রটিহীন সত্যকে কেবল আমাদের ব্যক্তিত্বের দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে পাই।] আর সে কারণেই উপনিষৎ বলেছেন—

যতোবাচোনিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥

অসীমের নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় দিক দুটি নিয়ে ঈশোপনিষৎ আলোচনা করে একটি শ্লোকে বলেছেন—

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥

নেতিবাচক গুণবিচারে ব্রহ্ম নিশ্চল। ইতিবাচক গুণবিচারে ব্রহ্ম সর্বকালের উপর ক্রিয়া করেন। তিনি কবি, তিনি তাঁর মনকে উপাদানরূপে ব্যবহার করেন। তিনি বন্ধনের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন। এই প্রকাশের উৎস তাঁর আনন্দের প্রাচুর্য। বাইরের কোনো প্রয়োজনের তাগিদে এই প্রকাশ ঘটে না। সুতরাং কেবল তিনিই অন্তহীন সময়ের মধ্য দিয়ে নিজেকে দান ক'রে আমাদের প্রয়োজন মেটাতে পারেন।

এখানেই আমরা আমাদের আদর্শকে পাই। নিত্য বর্জনই জীবনের সত্য। এর পূর্ণতায় আমাদের জীবনের পূর্ণতা। সকল অভিব্যক্তির মধ্যে আমাদের জীবনকে আমাদের কবিতা ক'রে গড়ে তুলতে হবে। এই রচনা আমাদের অনন্ত আত্মার পূর্ণ ব্যঞ্জনার ইঙ্গিতবাহী হবে। তা আমাদের সম্পদের প্রকাশস্থল হয়ে উঠবে না, কেননা সম্পদের কোনো নিজস্ব অর্থ নেই। আমাদের মধ্যে অসীমের যে চেতনা রয়েছে, তা আমাদের প্রাচুর্য থেকে আমাদের আত্মদানের আনন্দে আত্মপরিচয় দেয়। আর সেই কারণে আমাদের কর্ম আমাদের আত্মত্যাগের প্রক্রিয়া মাত্র। তা আমাদের জীবনের সঙ্গে এক হয়ে আছে। এ নদীর প্রবাহের মতো, আর এই প্রবাহই নদী।

আমাদের বাঁচতে হবে। জীবনের সত্য আনন্দকে আমাদের পেতে হবে। কবি তাঁর কবিতায় নিজেকে ঢেলে দিয়ে যে আনন্দ পান, এ আনন্দ তা'ই। আমাদের মধ্যে যে অনন্ত রয়েছে, আসুন তাকে আমরা আমাদের চারপাশের সব-কিছুতে প্রকাশ করি। আমাদের কর্মে, আমাদের ব্যবহৃত বস্তুতে, যে-সব মানুষের সঙ্গে আমরা ব্যবহার করি তাদের মধ্যে। আমাদের চারপাশের জগতের নানা উপভোগের মধ্যে আমরা এই অনন্তকে প্রকাশ

করি। আমাদের আত্মাকে আমাদের পরিবেশের মধ্য দিয়ে যেতে দিন ও সর্ববস্তুতে নিজেকে সৃজন করতে দিন, এবং সর্বকালের প্রয়োজনসাধনের মধ্য দিয়ে আপন পূর্ণতাকে দেখাতে দিন। আমাদের এই জীবন দিব্য দাতার উপহারে পূর্ণ হয়ে আছে। তারকামণ্ডলী এই জীবনের কাছে গান গেয়েছে; প্রভাত-আলোকের দৈনন্দিন আশীর্বাদ -পূত হয়ে এ জীবন ধন্য হয়েছে, ফলমূল এর কাছে সুমিষ্ট হয়েছে, এবং এর বিশ্রামের জন্য পৃথিবী তার শ্যামল তৃণাবরণ বিছিয়ে দিয়েছে। অনন্ত আত্মার স্পর্শে এই জীবন তার আত্মার আনন্দগানে অবাধে উৎসারিত হোক।

আর সে-কারণেই ঈশোপনিষদের কবি বলেছেন—

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে॥

কেবল পরিপূর্ণভাবে জীবন উপভোগ করেই আপনি একে উত্তীর্ণ হতে পারেন। বাতাসে নেচে, শাখা থেকে রস আহরণ করে, ও সূর্যালোকে পরিপক্ক হয়ে যখন ফলের জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন সে তার অন্তরে বাইরের আহ্বান শুনতে পায় এবং ব্যাপকতর জীবনের জন্যে প্রস্তুত হয়। জীবনধারণের বিচক্ষণ জ্ঞান আপনাকে এই জীবনত্যাগের ক্ষমতা দেয়। কারণ মৃত্যু হল অমরতার দ্বার। সে কারণে এ কথা বলা হয়েছে, কর্ম করো, কিন্তু কর্ম যেন তোমাতে লিপ্ত না হয়। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত কর্ম জীবনের সঙ্গে প্রবাহিত হয়, ততক্ষণ তা আপনার জীবনকে প্রকাশ করে। কিন্তু যখন তা জীবনের সঙ্গে লিপ্ত হয়ে যায়, তখন তা জীবনের প্রবাহকে রুদ্ধ করে, এবং জীবনকে নয়, নিজেকেই প্রদর্শন করে। তখন কর্ম নদীবাহিত বালুকার মতো আত্মা-স্রোতের গতিকে রুদ্ধ করে। শারীরিক জীবনের প্রকৃতিতে

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্ম প্রকাশিত হয়। কিন্তু যখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এলোমেলোভাবে আক্ষিপ্ত হয়, তখন তাদের চলাফেরার সঙ্গে জীবনের সঙ্গতি থাকে না, পরন্তু তা ব্যাধি হয়ে ওঠে। এ ঠিক সেই-সব কর্মের মতো যা মানুষকে জড়িয়ে ধরে, ও তার আত্মাকে হত্যা করে।

[না, আমরা অবশ্যই আমাদের আত্মাকে হত্যা করব না। আমরা এ কথা কিছুতেই ভুলব না যে আমাদের মধ্যে যে অনন্ত আছে, জীবন তাকে প্রকাশ করতেই এখানে এসেছে।] যদি আমরা আলস্যে অথবা মহতের স্বাধীনতাহীন বস্তুসমূহের অন্বেষণে রত হই, তবে আমরা আমাদের অনন্তের চেতনাকে শ্বাসরুদ্ধ ক'রে হত্যা করব। তার ফলে মৃতবীজ-যুক্ত ফলের মতো আমরা অসম্পূর্ণের আদিম তমসার রাজ্যে ফিরে যাব। জীবন হল নিরন্তর সৃষ্টি। যখন জীবন নিজেকে ছাড়িয়ে অনন্তের পথে যাত্রা করে তখন তা সত্যকে পায়। কিন্তু যখন জীবন থেমে যায়, সঞ্চয় করে ও ফিরে তাকায়, যখন সে পিছনের বাধা-অতিক্রমী দৃষ্টি হারিয়ে ফেলে, তখন জীবনকে মরতেই হয়। তখন জীবন সৃজনের জগৎ থেকে বিচ্যুত হয় এবং স্তূপীকৃত বস্তুনিচয়ের চাপে পড়ে বিনাশের ধূলিতে পরিণত হয়। তাদের সম্পর্কে ঈশোপনিষৎ বলেছেন—

অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

'আত্মা কী' এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ঈশোপনিষৎ এইভাবে—

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি॥

মনের নানা বাধানিষেধ আছে। সামনে যা আছে তা নিয়েই ইন্দ্রিয়গ্রাম খুব ব্যস্ত থাকে। কিন্তু আমাদের মধ্যে একত্বের প্রতিভা আছে, তা মনের চিন্তার সীমা উত্তীর্ণ হয়ে যায়। আবার এর উপস্থিতিতে জীবন-প্রেরণা জীবন-শক্তিসমূহকে নিয়তই সামনে এগিয়ে যেতে বলে। আমাদের মধ্যে এই একের সম্পর্কে আমরা সচেতন বলেই আমরা বিশ্বাস করতে পারি না যে এর মৃত্যু আছে, কেননা এই এক তার সকল বস্তুর চেয়ে বেশি, তা সকল ক্ষণ মুহূর্তের মৃত্যুকে অতিক্রম করে যায়। এই একের একত্বের জন্যে, অংশের চেয়ে এ বেশি বলে, এর ক্রমান্বয় ঊর্ধ্বতন ও নিরন্তর উৎসারের জন্যে আমরা একে মৃত্যুর সকল সীমার বাইরে অনুভব করি।

সকল সীমার বাইরে একত্বের চেতনা হল আত্মার চেতনা। আর এই আত্মা সম্পর্কে ঈশোপনিষৎ বলেছেন—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥

এ হল আত্মাকে দূর ও নিকটের, ভিতর ও বাইরের সীমা উত্তীর্ণ হয়ে জানা। সকল বিস্ময়ের মধ্যে এই-যে বিস্ময়, আমার মধ্যে এই-যে এক, আমার সকল বাস্তবতার কেন্দ্র এই এক-কে আমি জেনেছি। কিন্তু আমি এখানেই থামতে পারি না। আমি বলতে পারি না যে এ-সকল সীমাকে অতিক্রম করে গেছে, তথাপি আমাতে বাঁধা পড়েছে। সেই কারণে ঈশোপনিষৎ বলেছেন—

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

বিচ্ছিন্ন তথ্যাবলীব মাঝে যেমন সত্য লুকিয়ে থাকে সে ভাবেই আমাদের মধ্যে আমরা লুকিয়ে আছি। যখন আমরা জানি যে আমাদের মধ্যে এই এক সকলের মধ্যেই এক, তখনি আমাদের

সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়।

কিন্তু আত্মার ঐক্য সম্পর্কে এই জ্ঞান অবশ্যই বিমূর্ত হবে না। যা একজন বা অপরজনের মধ্যে নেই এমন নেতিবাচক বিশ্বৈকতা এ নয়। এই আত্মা বিমূর্ত আত্মা নয়, পরন্তু তা আমার আপন আত্মা— যাকে আমি অবশ্যই অপরের মধ্যে উপলব্ধি করব। আমি নিশ্চয়ই জানি যে যদি আমার আত্মা কেবলমাত্র আমারই হয়, তবে তা সত্য হতে পারে না ; সেই সঙ্গে এ'ও জানি যদি তা শেষ পর্যন্ত আমার না হয়, তবে তা বাস্তব নয়।

[ন্যায়শাস্ত্রের সাহায্যে আমরা কোনোদিনই এই সত্যে উপনীত হতে পারব না যে আমার মধ্যে ঐক্যবিধায়ক নীতিস্বরূপ যে আত্মা রয়েছে, তা অপরের মধ্যে পূর্ণতাকে পায়।] এই সত্যের আনন্দের মধ্য দিয়ে আমরা তাকে জেনেছি। আমাদের বাইরে আত্মোপলব্ধিতেই আমাদের আনন্দ। যখন আমি ভালোবাসি বা অন্য কথায়, যখন আমি ছাড়া অন্য কারোর মধ্যে আমি নিজেকে সত্যতররূপে উপলব্ধি করি, তখনি আমি খুশি হয়ে উঠি। কারণ তখন আমার মধ্যে যে এক রয়েছেন, তিনি অপরের সঙ্গে মিলিত হয়ে ঐক্যের সত্যকে উপলব্ধি করেন, আর সেখানেই তাঁর আনন্দ।

তাই ঈশ্বরের মধ্যে একের প্রেরণা ঐক্য উপলব্ধির জন্যে অবশ্যই বহুকে চাইবে। প্রেমের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সকলের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছেন। ঈশোপনিষৎ বলেছেন : তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। তিনি ত্যাগ করছেন। যখন আমি উপলব্ধি করি তিনি নিজেকে ত্যাগ করছেন, তখন আমি আনন্দ উপভোগ করি। কারণ আমার এই আনন্দ হল নিজেকে তাঁর মধ্যে ত্যাগ করা থেকে উৎপন্ন ভালোবাসার আনন্দ।

যখন ঈশোপনিষৎ আমাদের ঈশ্বরের ত্যাগ উপভোগের শিক্ষা

দেন, তখন বলেন : মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

কারণ আকাঙ্ক্ষা ভালোবাসার পক্ষে বাধা। এ হল সত্যের বিপরীত দিকে গতি, স্বার্থচিন্তা আমাদের শেষ উদ্দেশ্য— এই মায়ার দিকে গতি।

সুতরাং আমাদের আত্মোপলব্ধির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক রয়েছে। নৈতিক দিকে রয়েছে স্বার্থহীনতার শিক্ষা, আকাঙ্ক্ষার নিয়ন্ত্রণ; আধ্যাত্মিক দিকে রয়েছে সহানুভূতি ও ভালোবাসা। এদের একত্রে গ্রহণ করাই উচিত; কখনো স্বতন্ত্রভাবে দেখা উচিত নয়। কেবলমাত্র আমাদের প্রকৃতির নৈতিক দিকের চর্চা হৃদয়ের সংকীর্ণতা ও কাঠিন্যের অন্ধকার রাজ্যে আমাদের নিয়ে যায়, নিয়ে যায় ভালোত্বের অসহ্য দম্ভের পথে। আর কেবল আধ্যাত্মিক দিকের চর্চা আমাদের নিয়ে যায় কল্পনার অসংযমের অন্ধকারতর আমোদের ক্ষেত্রে।

ঈশোপনিষদের কবির অনুসরণে আমরা সকল বাস্তবতার অর্থে উপনীত হয়েছি, সেখানে সীমার মাধ্যমে অসীম নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছেন। কবিতা বা শিল্পকর্মের মতো বাস্তবতা ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। মহান্ পুরুষ তাঁর জগতে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছেন। আর যে ভাবে একটি কবিতার মধ্যে আমি নিজেকে আবিষ্কার করে কবিতাটিকে পাই, সে ভাবে আমি একে আপন করে নিচ্ছি। যদি আমার ব্যক্তিত্ব আমার জগতের কেন্দ্রচ্যুত হয়, তবে এক মুহূর্তেই তা তার সকল গুণ থেকে ভ্রষ্ট হয়। এর থেকে আমি জানি যে আমার জগতের অস্তিত্ব আমার সম্পর্কের উপরে প্রতিষ্ঠিত। আমি জানি যে এক ব্যক্তিগত সত্তা ব্যক্তিগত আমাকে এই জগৎ দিয়েছেন। এই দেবার প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞানের দ্বারা শ্রেণীভুক্ত ও সূত্রবদ্ধ করা যায়, কিন্তু দানকে আবদ্ধ করা যায় না। কারণ দান হল আত্মা

থেকে আত্মায়, সুতরাং কেবল আনন্দের মধ্যেই আত্মা একে উপলব্ধি করতে পারে, যুক্তিবিদ্যার দ্বারা একে বিশ্লেষণ করা যায় না।

সেই কারণে ব্যক্তিগত মানুষের একটি প্রার্থনা হল মহান্ পুরুষকে জানার প্রার্থনা। ইতিহাসের সূচনা থেকে সকল সৃষ্টিতে মানুষ ব্যক্তিত্বের স্পর্শ উপলব্ধি করেছে এবং তাকে নাম ও রূপ দিতে চেয়েছে। আর সেই উদ্দেশ্যে মানুষ তার ও মানবজাতির জীবনের চার দিকে নানা গল্পের জাল বুনেছে, এই ব্যক্তিত্বকে অর্চনা করেছে ও সংখ্যাতীত পূজোপচারের মধ্য দিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। ব্যক্তিত্বের স্পর্শের এই উপলব্ধি মানুষের হৃদয়ে এক কেন্দ্রাপসারী ঝোঁক সৃষ্টি করেছে যার ফলে মানবহৃদয় এক বিরামবিহীন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। সংগীতে চিত্রে কাব্যে, মূর্তিতে মন্দিরে উৎসবে মানবহৃদয় আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছে। আর কেন্দ্রাভিমুখী শক্তি মানুষকে আকর্ষণ করেছে নানা গোষ্ঠী, গোত্র ও সাম্প্রদায়িক সংগঠনে। মানুষ যখন ভূমি কর্ষণ ও বস্ত্র বয়ন করেছে, তার সন্তানদের লালনপালন করেছে, সম্পদের জন্য শ্রম ও শক্তির জন্য সংগ্রাম করেছে, তখন সে সুগম্ভীর ছন্দঝংকৃত ভাষায়, রহস্যময় প্রতীকে, মহনীয় প্রস্তর-শিল্পে এ কথা ঘোষণা করতে ভোলে নি যে তার জগতের হৃদয়তলে সে মৃত্যুঞ্জয় পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করেছে। মৃত্যুবেদনায় ও নৈরাশ্যযন্ত্রণায় যখন বিশ্বাস প্রতারিত ও ভালোবাসা অপমানিত হয়েছে, যখন অস্তিত্ব বিস্বাদ ও অর্থহীন হয়েছে, তখন সকল আশার ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে মানুষ আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তার অন্ধকার জগতের মাঝে সেই মৃত্যুঞ্জয় পুরুষের স্পর্শ অনুভব করতে চেয়েছে।

মানুষ এ কথাও জানে যে সেই মহান্ পুরুষের সঙ্গে ব্যক্তির

প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয়। তার মাধ্যম রূপ ও পরিবর্তনের জগৎ নয় বা দেশকাল-আলিঙ্গিত জগৎ নয়। এই সংযোগ স্থাপিত হয় চেতনার অন্তর্গূঢ় নির্জনতায়, গভীর ও তীব্র বেদনার রাজ্যে। এই সংযোগের মধ্য দিয়ে মানুষ এক নূতন জগতের সৃষ্টি উপলব্ধি করে ; সে জগৎ আলো ও ভালোবাসার জগৎ, নৈঃশব্দ্যের সংগীত ছাড়া তার অন্য কোনো ভাষা নেই। এর সম্পর্কেই কবি গেয়েছেন—

হে আমার ভাই, ঐ রয়েছে অন্তহীন জগৎ,
সেখানে আছে এক নামহীন সত্তা, যার বিষয়ে কিছুই
বলা যায় না।
কেবল সে-ই জানে যে সেই রাজ্যে উপনীত হয়েছে :
যা আমরা শুনেছি ও বলেছি, তা সবের বাইরে এই জগৎ।
রূপ, আকার, দৈর্ঘ্য প্রস্থ, কোনো কিছুই সেখানে দেখা যায় না :
আমি কি ভাবে তোমায় জানাব এ কী ?
কবীর বলেন, মুখের কথায় এর বর্ণনা দেওয়া যায় না :
কাগজে একে লেখা যায় না :
এ যেন এক বোবা লোক যে মিষ্টি খেয়েছে— কিন্তু তা কি করে
সে বলবে ?
না, একে ব্যাখ্যা করা যায় না, একে উপলব্ধি করতে হয়।
আর মানুষ যখন তা করে, তখন সে গেয়ে ওঠে—

আজ অন্তর ও বাহির একই আকাশে পরিণত হয়েছে,
সীমা আর অসীম মিলিত হয়েছে :
এ-সবের দৃশ্য দেখে আমি আনন্দে মাতাল হয়েছি।

এখানে কবি অনির্বচনীয় সত্যে উপনীত হয়েছেন, সেখানে সকল বিরোধের সমন্বয় হয়েছে। কারণ পরম সত্য সেই মহান্

পুরুষে নিহিত, তা বাইরের আইনে ও পদার্থে নেই। আর মানুষ অবশ্যই এ কথা উপলব্ধি করবে যে যদি এই বিশ্ব এক মহান্ পুরুষের প্রকাশ না হয়, তবে এ এক বিরাট প্রতারণা ও তার প্রতি চিরস্থায়ী অপমান। মানুষের জানা উচিত, বিচ্ছিন্নতার বিশাল গুরুভারে গোড়াতেই তার ব্যক্তিত্ব গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে, আকৃতি হারাবে এবং এমন এক বিমূর্ততার অর্থহীনতায় বিলীন হয়ে যাবে যার ধারণা করার মতো মনের ভিত্তি পর্যন্ত নেই।

ঈশোপনিষদের কবি তাঁর উপদেশাবলীর শেষভাগে আকস্মিকভাবে একটি শ্লোকে আত্মোদ্‌ঘাটন করেছেন— যা তার সারল্যে প্রভাত-সূর্যের প্রতি বিশাল পৃথিবীর দৃষ্টিক্ষেপের গীতি-নৈঃশব্দ্যবাহী। কবি গেয়েছেন—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজো
যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥

তার পর উপসংহারে মৃত্যুহীন ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই কবি মৃত্যু সম্পর্কে গেয়েছেন- -

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর॥
অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো'
ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম।

জীবন থেকে মৃত্যুতে, আবার মৃত্যু থেকে জীবনে যিনি

পরিভ্রমণ করেছেন, ঈশোপনিষদের সেই কবি এইখানেই থেমেছেন। ব্রহ্মকে অনন্ত সত্তারূপে ও সীমাবদ্ধ প্রাণীরূপে একই সঙ্গে দেখার সাহস তাঁর আছে। তিনি ঘোষণা করেছেন কর্মের মধ্যেই জীবন, কর্মই আত্মাকে ব্যক্ত করে। আমাদের সত্তা বর্জনে ও সকলের সঙ্গে মিলনে সেই মহান্ সত্তার মধ্যে আমাদের আত্মাকে উপলব্ধি করার শিক্ষা তিনি আমাদের দিয়েছেন।

ঈশোপনিষদের কবি যে গভীর সত্যকে প্রকাশ করেছেন সে সত্য সরল মনের সত্য ; তা বাস্তবতার রহস্যের সঙ্গে গভীর প্রেমে আবদ্ধ। আর যে যুক্তি তার বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়ার দ্বারা বিশ্বকে ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে আসে সেই যুক্তির চূড়ান্ত বক্তব্যে এই সত্য বিশ্বাস স্থাপন করে না।

এই জগৎ আমার আত্মার একীভূত— এই উপলব্ধির আকস্মিক আনন্দ-উৎসার আমার হৃদয়কে যখন পরিপূর্ণ করে ফেলে, তখন কি সূর্যালোক আরো উজ্জ্বল ও চন্দ্রালোক কোমলতায় আরো গভীর বলে আমি অনুভব করি নি ? যখন আমি বর্ষাগমের গান গাই, তখন ধারাপতনের শব্দের বিষাদ আমার গানে রূপ লাভ করে। আমাদের ইতিহাসের ঊষাকাল থেকে কবি ও শিল্পীর দল অস্তিত্বের কাঠামোয় তাঁদের আত্মার রঙ ও গান প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছেন। আর এ থেকেই আমি নিশ্চিত করে জানি যে, এই পৃথিবী ও আকাশের সঙ্গে মানুষের মনের ধূপছায়া বস্ত্রের বুনট হয়েছে, কেননা এই মানুষের মনই একই সঙ্গে বিশ্বগত মন। যদি তা সত্য না হয়, তবে কাব্য হবে মিথ্যা, গান হবে প্রতারণা, এবং মূক জগৎ মানুষের হৃদয়কে একান্ত নিস্তব্ধতায় আবদ্ধ করবে। মহান্ প্রভু বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে চলেছেন ; ফুৎকার তাঁর নিজের, কিন্তু বাদ্যযন্ত্র আমাদের মন। এর মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর সৃষ্টির সংগীত

রচনা করেন, আর সে-কারণে আমি জানি, আমার অস্তিত্বের যাত্রাপথে এই পৃথিবীর পথের ধারে পান্থশালায় আমি নিতান্ত আগন্তুক মাত্র নই। পরন্তু আমি এমন এক জগতে বাস করি যার জীবনের সঙ্গে আমার জীবন বাঁধা পড়ে গেছে। কবি জানেন যে এই জগতের সত্যতা ব্যক্তিগত, আর তাই তিনি গেয়েছেন—

এই পৃথিবী তাঁর আনন্দ ; আকাশ তাঁর আনন্দ ;
সূর্য-চন্দ্রের আলোকধারা তাঁর আনন্দ ;
সৃষ্টির সূচনা, মধ্য জীবন ও অন্তিম জীবন তাঁরই আনন্দ ;
আলোক, আঁধার ও দৃষ্টি তাঁর আনন্দ।
সমুদ্র ও তরঙ্গাবলী তাঁর আনন্দ ;
সরস্বতী, যমুনা, গঙ্গা তাঁর আনন্দ।
প্রভু এক ; তিনি জীবন ও মৃত্যু,
মিলন ও বিচ্ছেদ— সবই তাঁর আনন্দের লীলা।

আমাদের কাছে অচেতন প্রকৃতি হল অস্তিত্বেব বাইরের রূপ। আমরা কেবল জানি এই প্রকৃতি কী ভাবে আমাদের সামনে দেখা দেয়। কিন্তু এই প্রকৃতি কী, তা আমরা জানি না। কেবল সহানুভূতির দ্বারাই আমরা তাকে জানতে পারি।

কিন্তু যবনিকা উঠে যায়, রঙ্গমঞ্চে জীবনের আবির্ভাব হয়, এবং শুরু হয় নাটক। এই নাটকের অর্থ আমাদের ইশারা ও ভাষার সদৃশ জীবনের ইঙ্গিত ও ভাষার দ্বারা আমরা বুঝতে পারি। জীবন যে কী, তা আমরা জানি বাইরের বৈশিষ্ট্য বা অংশ বিশ্লেষণের দ্বারা নয়। সহানুভূতির সাহায্যে প্রত্যক্ষতর অনুভূতিব দ্বারাই আমরা জীবনকে জানি। আর এই হল সত্যকারের জ্ঞান।

আমরা একটি গাছকে দেখি। তার ব্যক্তিগত জীবনের দ্বারাই গাছটি পরিবেশ থেকে স্বতন্ত্র রূপে দেখা দেয়। বিশ্বের সব-কিছু থেকে তার সৃজনশীল ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করায় গাছটিব সকল প্রয়াস ব্যয়িত হয়। [গাছটির জীবন এক দ্বৈততার উপর স্থাপিত, এক দিকে তার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য, অপর দিকে বিশ্ব।]

কিন্তু যদি এই দ্বৈততা বিরোধিতা ও পারস্পরিক বর্জনের ভিত্তিতে গড়ে উঠত, তা হলে গাছটির পক্ষে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার কোনো অবকাশ থাকত না। প্রচণ্ড শক্তিসমূহ গাছটিকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলত। এই দ্বৈততা সম্পর্কের দ্বৈততা। সূর্যালোক, মাটি ও ঋতুচক্রের সঙ্গে গাছটির সঙ্গতি যত ত্রুটিহীন হবে, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্রে গাছটি ততই নিখুঁত হবে। যখন এই আন্তঃসম্পর্ক রুদ্ধ হয়, তখন গাছটির পক্ষে তা অকল্যাণকর হয়। সুতরাং নেতিবাচক দিকে জীবনকে সব-কিছু থেকে স্বাতন্ত্র্য

বজায় রেখে চলতে হয়; আবার ইতিবাচক দিকে জীবন বিশ্বের সঙ্গে ঐক্য রক্ষা করে। এই ঐক্যে জীবনের পরিপূর্ণতা।

একটি পশুর জীবনে নেতিবাচক দিকের এই স্বাতন্ত্র্যের উপাদান খুব স্পষ্টতর হয়ে ওঠে ও সেই কারণে ইতিবাচক দিকে জগতের সঙ্গে পশুর সম্পর্ক ব্যাপকতর হয়ে ওঠে। পশু থেকে পশুর খাদ্য আরো সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন। সুখ ও বেদনার তাড়নায় পশুকে খাদ্য সংগ্রহ করতে হয় ও জানতে হয়। সুতরাং পশুর জ্ঞান ও অনুভবের রাজ্যের সঙ্গে পশুর আরো সম্পূর্ণতর সম্পর্ক বর্তমান। যৌনস্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্রে পশুর জীবনে এটি আরো বেশি সত্য। এই-সব স্বাতন্ত্র্য ও মিলনের পরবর্তী প্রয়াস পশুর স্বার্থচেতনাকে তুলে ধরে। তার ফলে অ-পূর্বদৃষ্ট বাধা ও অপ্রত্যাশিত সম্ভাবনার সঙ্গে পশুর সংযোগ স্থাপিত হয় ও তাদের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। গাছের ক্ষেত্রে সন্তানপরম্পরা থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতায় শেষ হয়, আর পশুর ক্ষেত্রে তা থেকে নূতন সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এইভাবে পশুদের মূল-কৌতূহল গভীরতর ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হয়ে যায়, এবং তাদের চেতনা ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়। পশুদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের এই বিস্তৃততর ক্ষেত্র তাদের জগতের সঙ্গে জটিল সম্পর্কের মধ্য দিয়ে নিয়ত বজায় রাখতে হয়। এই পথে সব বাধাই তাদের পক্ষে অমঙ্গলকর।

মানুষের ক্ষেত্রে শারীরিক জীবনের এই দ্বৈততা আরো বিচিত্র। তার প্রয়োজন কেবল যে সংখ্যায় বেশি ও সে কারণে অন্বেষণের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত, তা নয়; সেই সঙ্গে তার প্রয়োজন আরো জটিল ও সে কারণে বস্তুর গভীরতর জ্ঞানের প্রত্যাশী। এর ফলে মানুষ নিজের সম্পর্কে বৃহত্তর চেতনার অধিকারী হয়। গাছ ও পশুর স্বতশ্চল ও স্বতঃপ্রবৃত্ত কাজের ক্ষেত্রটি আরো বেশি পরিমাণে

মানুষের মন দখল করে নেয়। এই মনেরও স্বাতন্ত্র্য ও ঐক্যের নেতিবাচক ও ইতিবাচক দিক রয়েছে। কারণ, মানুষের মন জ্ঞানের বস্তুগুলিকে তাদের জ্ঞাতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে, এবং তার পরে আবার জ্ঞানের সম্পর্কে তাদের ঐক্যসূত্রে বাঁধে। খাদ্যসংগ্রহ ও যৌনক্রিয়ার মূল সম্পর্কের জগতে আরেকটি অপ্রধান সম্পর্ক যুক্ত হয়; তা হল মানসিক সম্পর্ক। এইভাবে এই জগতে বেঁচে থেকে ও এই জগৎকে জেনে আমরা একে দুবার করে পাই।

কিন্তু মানুষের মধ্যে আর একটি বিরোধ রয়েছে। তা মানুষের শারীরিক জীবনের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় না। যা আছে ও যা হওয়া উচিত— এই নিয়ে মানুষের চেতনার মধ্যে যে দ্বৈততা বর্তমান, তা-ই হল এই নূতন বিরোধ। পশুর মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য নেই কেননা পশুর মধ্যে বিরোধ, যা আছে ও যা চাওয়া হয়েছে— তার মধ্যে। আর মানুষের মধ্যে বিরোধ— যা চাওয়া হয়েছে ও যা চাওয়া উচিত— তার মধ্যে। যা চাওয়া হয়েছে, তার অধিষ্ঠান প্রাকৃতিক জীবনে, সেখানে আমরা পশুদের সহযাত্রী। কিন্তু যা চাওয়া উচিত, তার অধিষ্ঠান এমন এক জীবনে যা এই জীবন থেকে বহু দূরে।

সুতরাং মানুষের দ্বিতীয় জন্ম ঘটেছে। মানুষ তার পশু-জীবনের বেশ কিছু অভ্যাস ও প্রবৃত্তি এখনো বজায় রেখেছে। তথাপি মানুষের সত্য জীবন, যা হওয়া উচিত, সেক্ষেত্রেই রয়েছে। এই ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়তা সত্ত্বেও বিরোধ রয়েছে। বহু জিনিসই যা এক জীবনের পক্ষে কল্যাণকর, অপর জীবনের পক্ষে তা অকল্যাণকর। নিজের মধ্যে এই সংগ্রামের আবশ্যকতা মানুষের ব্যক্তিত্বে একটি নূতন উপাদান যুক্ত করেছে; তা হল চরিত্র। আকাঙ্ক্ষার জীবন থেকে এই চরিত্র মানুষকে উদ্দেশ্যের জীবনের পথে চালনা করে।

এই জীবন নৈতিক জগতের অন্তর্গত।

এই নৈতিক জগতে আমরা প্রকৃতির জগৎ থেকে মানবতার জগতে উপনীত হই। আমরা জীবনধারণ ও চলাফেরা কবি এবং বিশ্বমানবে আমাদের সত্তাকে পাই। একটি মানবশিশু একই সময়ে জাগতিক বিশ্বে ও মানবতার বিশ্বে জন্মগ্রহণ কবে। এই শেষোক্ত জগৎ নানা আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানের জগৎ, সঞ্চিত জ্ঞান ও শিক্ষাপ্রাপ্ত অভ্যাসের জগৎ। বহু বীরের আত্মত্যাগে, বহু যুগের কৃচ্ছ্র সাধনায় এই জগৎ গড়ে উঠেছে। সর্ব যুগের ও দেশের সংখ্যাতীত ব্যক্তি-মানুষের আত্মত্যাগের উপর এই জগতের ভিত্তি গড়ে উঠেছে। এই জগতে সৎ ও অসৎ উপাদান আছে— উপরিতলের ও উত্তাপের অসমতা আছে, আর তারই ফলে মানুষের জীবন নানা বিস্ময়ে ভরে ওঠে।

এই হল মানুষের দ্বিতীয় জন্মের জগৎ; অতি-প্রাকৃত জগৎ। এখানে পশুজীবন ও নৈতিক জীবনের দ্বৈতত৷ মানুষ হিসেবে আমাদের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে তোলে। নৈতিক জগতেব সঙ্গে মানুষের এই জীবনের ত্রুটিহীন সম্পর্ক-প্রতিষ্ঠায় যা বাধা সৃষ্টি করে, তাই মানুষের পক্ষে অকল্যাণকর। এই হল মৃত্যু— প্রাকৃতিক জীবনের মৃত্যুর চেয়ে তা অনেক বড়ো মৃত্যু।

প্রাকৃতিক জগতে বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ পদার্থ-শক্তিসমূহের পীড়নকে আনুগত্যে পরিবর্তিত কবে তুলছে।

কিন্তু নৈতিক জগতে মানুষকে কঠিনতর কর্ম সাধন করতে হচ্ছে। মানুষকে তার নিজের প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষাসমূহের পীড়নকে আনুগত্যে পরিণত করতে হচ্ছে। আর সর্বকালে ও সর্ব ঋতুতে মানুষের বিরামহীন সাধনা এই উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হচ্ছে। আমাদের প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানই এই-সব সাধনার ফল। এই সাধনা আমাদের

ইচ্ছাশক্তিকে পরিচালিত করছে ও শক্তির ব্যর্থ অপচয় বাদ দিয়ে এই ইচ্ছার স্বচ্ছন্দগতিতে যাবার পথ উন্মুক্ত করে দিচ্ছে।

আমরা দেখেছি শারীরিক জীবন ধীরে ধীরে মানসিক জীবনে বিস্তৃত হচ্ছে। জীবনের অতিপ্রত্যক্ষ প্রয়োজনের জ্ঞানে ও অন্বেষণে পশুর মন সম্পূর্ণ ব্যাপৃত থাকে। মানুষের ক্ষেত্রে এই প্রয়োজন বিচিত্র, আর সেজন্যে বৃহত্তর মনঃশক্তির প্রয়োজন। এইভাবে আমরা জানতে পারি, যে-জগৎ অন্তহীনভাবে আমাদের বর্তমান প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে যায় তার সঙ্গে এই প্রয়োজনের জগতের মিল আছে। আমরা জানতে পারি, এই জগৎ আমাদের কেবল খাদ্য যোগায় না, সেই সঙ্গে ব্যাপকতর পরিমাণে চিন্তাও যোগায়। আমরা জানতে পারি, সকল বস্তুর সঙ্গে আমাদের মনের একটি সূক্ষ্মতর সম্পর্ক রয়েছে।

প্রকৃতির জগতে যা বিচারশক্তি, তাই নৈতিক জগতে আমাদের ইচ্ছাশক্তি। আমাদের এই ইচ্ছাশক্তি যত মুক্ত ও বিস্তারিত হবে, আমাদের নৈতিক সম্পর্ক ততই সত্য, বিচিত্র ও ব্যাপক হবে। এই ইচ্ছাশক্তির বাইরের মুক্তি হল সুখ ও বেদনার শাসন থেকে মুক্তি; আর অন্তরের মুক্তি হল স্বার্থ-সাধনের সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি। আমরা জানি স্বার্থের দাসত্ব থেকে বিচারশক্তি মুক্তি পেলে তা বিশ্বগত যুক্তির জগৎকে আবিষ্কার করে। আমাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে আমরা অবশ্যই এই জগতের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করব। একই ভাবে, যখন ইচ্ছাশক্তি বাধামুক্ত ও সৎ হয়, অর্থাৎ এর ক্ষেত্র সর্বমানবে ও সর্বকালে প্রসারিত হয়, তখন তা মানুষের নৈতিক জগৎকে অতিক্রম করে আর-এক জগতের প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত করে। এই ইচ্ছাশক্তি এমন এক জগৎ আবিষ্কার করে যেখানে আমাদের নৈতিক জীবনের সকল সংযম তাদের পরম

সত্যকে পায়, এবং আমাদের মন এই ধারণায় উন্নীত হয় যে সত্যের এমন একটি অনন্ত মাধ্যম আছে যার মধ্য দিয়ে সততা সার্থকতা খুঁজে পায়। অপরের সঙ্গে মিলনের মধ্য দিয়ে আমি যে হয়ে উঠছি— এটি অঙ্কের সরল তথ্য নয়। আমরা জানি যে পূর্ণ মিলনের ক্ষেত্রে যখন নানা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব প্রেমে আবদ্ধ হয়, তখন সে মিলনকে কর্মদক্ষতার শক্তি বেড়ে যাবার সমতুল মনে করা যায় না। বরং সত্যের মাঝে অপূর্ণ যে ভাবে পূর্ণতাকে পায়, এই মিলনকে সে রকম প্রাপ্তি মনে করা যেতে পারে। আর সে কারণেই এটা হল আনন্দের প্রাপ্তি। সম্পর্কহীন অবস্থায় যা ছিল অর্থহীন, সম্পর্কযুক্ত হয়ে তা খুঁজে পায় পূর্ণ অর্থকে। এই পূর্ণতা পরিমাপ বা বিশ্লেষণের বস্তু নয়, তা হল সামগ্রিকতা; তা সকল অংশকে ছাড়িয়ে যায়। এই পূর্ণতা আমাদের নিয়ে যায় এক রহস্যের দিকে। সে রহস্যের অধিষ্ঠান সকল বস্তুর হৃদয়ে, তথাপি তার বাইরে। একটি ফুলের সৌন্দর্য যেমন তার উদ্ভিদজগতের তথ্যকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে যায়; অথবা মানবতাবোধ যেমন নিছক যূথচারিতায় আবদ্ধ হয় না, তেমনি এই রহস্য বস্তুকে অতিক্রম করে যায়।

ভালোবাসায় পূর্ণতা প্রাপ্তির এই অনুভূতি হল পূর্ণ একত্বের অনুভূতি। তা আমাদের সামনে অনন্ত একের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। সেই অনন্ত এক সকল ব্যক্তিত্বের মিলনে উদ্‌ঘাটিত হন। তিনি স্বার্থবিসর্জনের ক্ষেত্রে, বৃহত্তর জীবনের আশায় মৃত্যুতে ও বৃহত্তর লাভের আশায় ক্ষতিতে সত্য আরোপ করেন। ত্যাগের শূন্যতাকে আপন পূর্ণতার দ্বারা তিনি পূর্ণ করেন। এখানেই আমরা আমাদের জীবনে বৃহত্তম বিভেদের সম্মুখীন হই— সে বিভেদ সীমা অসীমের বিভেদ। আমাদের মধ্যে যা আছে ও

আমাদের বাইরে যা আছে, এ দুয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে এখানেই আমরা সচেতন হই। বর্তমান মুহূর্তে যা আছে ও ভবিষ্যতে যা আসবে, এ দুয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই।

আমাদের শারীরিক অস্তিত্বের সঙ্গেই এই সম্পর্কের চেতনা আমাদের মধ্যে দেখা দেয়। সেখানে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন ও বস্তুগত বিশ্বজীবনের মধ্যে বিচ্ছেদ ও মিলন রয়েছে। তা আমাদের মানসিক জীবনে গভীরতর রঙের প্রলেপ দিয়েছে। সেখানে আমাদের ব্যক্তিগত মন ও বিশ্বগত যুক্তির জগতের মধ্যে বিচ্ছেদ ও ক্রমান্বয় পুনর্মিলন স্থাপিত হচ্ছে। যেখানে ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও বিশ্বগত মানবিক ব্যক্তিত্বের জগতের মধ্যে বিচ্ছেদ ও মিলন বর্তমান, সেখানে এই চেতনা বিস্তারিত হচ্ছে। আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত এক ও অনন্তের মধ্যে বিশ্বগত এক— এ দুয়ের মধ্যে যে বিচ্ছেদ ও মিলন রয়েছে, সেখানেই এই চেতনা পরম অর্থে উপনীত হয়। আর একের সঙ্গে একের এই চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ ও মিলনের বিন্দুতে মানুষের বিস্ময়কর সংগীত ধ্বনিত হয়ে ওঠে—

এষাস্য পরমা গতিঃ,
এষাস্য পরমা সম্পৎ।
এষোঽস্য পরমো লোকঃ,
এষোঽস্য পরম আনন্দঃ॥

সেই এক ও এই একের সম্পর্কই জীবন। বস্তু ও মানুষের জগতে সেই এক ও এই একের নৃত্যস্পন্দন অন্তহীন ছন্দে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই পরম এক ও এই পরম একের মধ্যে উপলব্ধি পূর্ণ হয়ে উঠছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই সম্পর্কের অর্থ প্রকাশিত হচ্ছে না।

মাতৃগর্ভে অজাত শিশুর সঙ্গে তার পরিবেশের যে সম্পর্ক,

তা অন্তরঙ্গ, কিন্তু তার চরম অর্থ নেই। সেখানে তার সকল প্রয়োজন খুঁটিনাটি সমেত মিটে যাচ্ছে, কিন্তু তার বৃহত্তম প্রয়োজন অপূর্ণ রয়ে যাচ্ছে। আলো আর ভূমির জগতে তাকে জন্মাতেই হবে ও কর্মের স্বাধীনতা তাকে পেতেই হবে। মাতৃগর্ভের জগৎ থেকে সেই জগৎ প্রতিটি ক্ষেত্রে এত ভিন্নতর যে, যদি অজাত শিশুর চিন্তা করার ক্ষমতা থাকত, তবে সে কখনো কল্পনা করতে পারত না বাইরের জগৎটা কী। তথাপি তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি রয়েছে, কিন্তু আলো বাতাসের মুক্ত জগতেই তাদের অর্থ আছে।

একই ভাবে প্রাকৃতিক জগতে আপন সত্তার শুশ্রূষার সকল আয়োজন মানুষের আছে। সেখানে তার আপন সত্তার স্বার্থই মানুষের প্রধান চিন্তার বিষয়। এই সত্তা আপন স্বার্থে অন্যান্য সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন। তার জগতের সব-কিছুই তার স্বার্থের অনুযায়ী। মানুষের ব্যবহার ছাড়া সে-সবের মধ্যে অন্য কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু অজাত শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো মানুষের মধ্যে কয়েকটি ক্ষমতা গড়ে ওঠে। এই ক্ষমতাই মানুষকে জগতের ঐক্য উপলব্ধি করবার শক্তি দেয়। সে ঐক্য আত্মার গুণ, বস্তুনিচয়ের গুণ নয়। অপরের মধ্যে আনন্দ, সৌন্দর্য ও প্রেমের মধ্যে আনন্দ, এমন-কি নিজের মধ্যে আনন্দ উপভোগের ক্ষমতা মানুষের আছে। যে ক্ষমতা মানুষকে সুখ উপেক্ষা করতে এবং বেদনা ও মৃত্যু গ্রহণ করতে প্ররোচনা দেয়, যা মানুষকে তার অগ্রগতির সকল সীমা লঙ্ঘন করতে বলে, এবং তাকে জ্ঞান ও কর্মের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়, সে ক্ষমতা মানুষের কোনো আপাত প্রয়োজনে লাগে না। এর ফলে প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে মানুষের বিরোধ উপস্থিত হয়, এবং যোগ্যতমের উদ্বর্তন নীতির অর্থ পরিবর্তিত হয়।

এখানেই মানুষের দ্বৈততার বৃহত্তম দুঃখ উপস্থিত হয়— প্রকৃতি-জগতের ও আত্মার জগতের দ্বৈততায় সংঘর্ষ লাগে। প্রাকৃতিক মানুষকে যে অন্যায় আঘাত করে তার নাম বেদনা। কিন্তু যা মানুষের আত্মাকে আঘাত করে তাকে একটি বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছে, তা হল পাপ। কারণ বেদনার মধ্যে হয়তো এই পাপকে অনুভব করাই যাবে না। তথাপি তা অন্যায়। ঠিক যেমন ভ্রূণের কাছে অন্ধতা বা খঞ্জতার কোনো অর্থ নেই, তথাপি জন্মের পরে যদি তা চলতে থাকে তো সেটা বড়ো অমঙ্গল হয়ে ওঠে। কারণ সেটা জীবনের পরম উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। মানুষের বিরুদ্ধে দুষ্কর্ম সাধিত হয়; কিন্তু পাপ অনুষ্ঠিত হয় আমাদের মধ্যে যে ঐশ্বরিক শক্তি আছেন তাঁরই বিরুদ্ধে।

এই ঐশ্বরিক শক্তি কী? এটা হল সেই শক্তি যার যথার্থ ও সত্য অর্থ নিহিত আছে অনন্তে, যা মানবসত্তার ভ্রূণজীবনকে পরম সত্য বলে বিশ্বাস করে না। জন্মযন্ত্রণা মানবজাতিকে ব্যাপ্ত করে আছে। তার ইতিহাস বেদনার ইতিহাস, কোনো পশু কখনো তা উপলব্ধি করতে পারে না। তার সমস্ত শক্তি জন্মযন্ত্রণাকে সামনের দিকে এগোতে বলছে; তার কোনো বিশ্রাম নেই। যখন তা প্রাচুর্যের ফলে নিদ্রামগ্ন হয়, জীবনকে প্রথাবদ্ধ করে, জীবনের আদর্শকে বিদ্রূপ করতে শুরু করে এবং স্বার্থবুদ্ধির পথে তার সকল শক্তিকে প্রয়োগ করতে চায়, তখন তা মৃত্যুলক্ষণ প্রকাশ করে। তার এই শক্তি তখন ধ্বংসের শক্তি হয়ে দাঁড়ায়— সে শক্তি মৃত্যু-সাধনের জন্য বিপুল আয়োজন করে এবং অনশ্বর জীবনে আর বিশ্বাস করে না।

আর সব প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রকৃতিই চূড়ান্ত। বেঁচে থাকা, বংশ রক্ষা করা ও মরে যাওয়াতেই তাদের সমাপ্তি। আর তাতেই

তারা তৃপ্ত। তারা কখনো মুক্তির জন্যে, জীবনের সীমাবন্ধন থেকে ছাড়া পাবার জন্যে ক্রন্দন করে না। তারা কখনো শ্বাসরুদ্ধ বোধ করে না ও তাদের জগতের চারপাশের সীমাপ্রাচীরকে ভেঙে ফেলতে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত করে না। তারা কখনো জানে না প্রাচুর্যের জীবন ত্যাগ করার অর্থ কী, এবং কৃচ্ছ্রসাধনার দ্বারা পুণ্যবানের রাজ্যে প্রবেশাধিকার তারা কখনো চায় না। তারা তাদের আকাঙ্ক্ষার জন্য লজ্জিত নয় ; তারা ক্ষুধায় নির্ভেজাল। কারণ এই-সব নিয়েই তাদের জীবন সম্পূর্ণ। তারা তাদের নিষ্ঠুরতার মধ্যে নিষ্ঠুর নয়, লোভে তারা লোভী নয় ; কারণ তা তাদের বিষয়েই শেষ হয়ে যায়, আব এই বিষয় আপনাতেই সম্পূর্ণ। কিন্তু মানুষের আর এক জীবন আছে। আর সেখানে মানুষ এই-সব প্রবৃত্তিকে ঘৃণা করে। কারণ সেগুলি তার অনন্তকে স্বীকার করে না।

মানুষের মধ্যে পশুর জীবন আরো বাঁক নিয়েছে। মানুষ এই নতুন জগতের সূচনায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার ইচ্ছা ও ক্ষমতা দিয়ে মানুষকে এই জগৎ বচনা করতে হবে। যে প্রাথমিক স্তরে স্বার্থ-সত্তা তার চার দিকের সব বস্তুকে নিজের কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করার চেষ্টা করে এবং কিছুই ফিরে দেয় না, সে স্তর আজ পার হয়েছে। মানুষ এখন তার সৃজনশীল জীবনের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। তার প্রাচুর্য থেকে তাকে এখন দান করতে হবে। তার নিরন্তর ত্যাগের মধ্য দিয়ে মানুষকে গড়ে উঠতে হবে। যা-কিছু এই অন্তহীন বিকাশের স্বাধীনতাকে ব্যাহত করে, তাই পাপ। পাপ মানুষের অনন্তের বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল অসৎ বস্তু। মানুষের জীবন-অধ্যায়ের সূচনা থেকে এই সৃজনশীল উদ্যম আত্মপ্রকাশ করছে। এমন-কি তার শারীরিক প্রয়োজনসমূহও প্রকৃতির ক্ষেত্র

থেকে তৈরি অবস্থায় সরবরাহ করা হয় নি। আদিম যুগ থেকে মানুষ তার চার পাশের কাঁচা উপাদান থেকে নিজস্ব সম্পদের জগৎ রচনায় ব্যস্ত থেকেছে। এমন-কি তার আহার্যদ্রব্যও তার নিজের তৈরি ; পশুর পথ ছেড়ে তাকে উলঙ্গ হয়ে জন্মাতে হয়েছে ও নিজের পরিধেয় তৈরি করে নিতে হয়েছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, মানুষ প্রকৃতিব উদ্দেশ্যের জগৎ থেকে স্বাধীনতার জগতে জন্ম নিয়েছে।

সৃষ্টিই মুক্তি। যা আছে তার মধ্যে জীবনধারণের অর্থ বন্দী-শালায় বাস। কারণ তা হল যা আমাদের নয়, তারি মধ্যে জীবনধারণ। সেখানে আমরা অসহায়ভাবে প্রকৃতিকে আমাদের ও আমাদের জন্য সব-কিছু নির্বাচন করতে দিই। তার ফলে আমরা প্রাকৃতিক নির্বাচন-আইনের অধীন হয়ে পড়ি। কিন্তু আমাদের নিজস্ব সৃষ্টিক্ষেত্রে যা আমাদের নিজস্ব, তাতেই জীবন-ধারণ কবি এবং সেখানে জগৎ ক্রমশই বেশি পরিমাণে আমাদের নিজস্ব নির্বাচনের জগৎ হয়ে ওঠে। এই জগৎ আমাদের চলাফেরার সঙ্গে চলে এবং আমরা যে দিকে যাই সেদিকে পথ ছেড়ে দেয়। এইভাবে আমরা দেখি মানুষ যে জগৎ পেয়েছে, তা নিয়ে সে তৃপ্ত নয়। সে এই জগৎকে আপনার জগৎরূপে গড়ে তুলতে উদ্যত হয়েছে। আর বিশ্বের যান্ত্রিক কাঠামোকে মানুষ টুকরো টুকরো করে দেখছে, তাকে পরীক্ষা করছে, এবং তাকে আপন প্রয়োজন অনুসারে পুনর্বিন্যস্ত কবছে। বস্তুজগতেব প্রাকৃতিক ব্যবস্থার বিধিনিষেধের মধ্যে মানুষ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এই-সব নিষেধ তাব স্বাধীনতাকে প্রতি পদে ব্যাহত করছে ও তাকে পদার্থের শাসন সহ্য করতে হচ্ছে। অথচ মানুষের প্রকৃতি এই শাসনকে চূড়ান্ত ও অপরিহার্য বলে মেনে নিতে রাজি নয়।

এমন-কি তার অসভ্য যুগে মানুষ যাদুবিদ্যার জোরে বস্তুকে

বদ্‌লে দিয়েছে। পশু কখনো যা করে নি, মানুষ তা করেছে; সে আলাদিনের চেরাগের স্বপ্ন দেখেছে। তার পছন্দমত পৃথিবীকে উলটপালট করার জন্য আজ্ঞাবাহী দৈত্যশক্তির স্বপ্ন মানুষ দেখেছে। কারণ মানুষের মুক্ত আত্মা চলাফেরায় তার সম্পর্কে বিবেচনাহীন বস্তুবিন্যাসের কাছে হোঁচট খেয়েছে। তার সম্মতিহীন প্রাকৃতিক ব্যবস্থাকে মানুষের মেনে চলতেই হবে, অথবা মরতে হবে— এইভাবে মানুষ ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বহু স্থূল তথ্য থাকা সত্ত্বেও মানুষ অন্তরের অন্তরে কখনো তাকে বিশ্বাস করতে পারে নি। সেইজন্য মানুষ স্বর্গের স্বপ্ন দেখেছে; সেখানে সে মুক্ত। যখন দেবতাদের সঙ্গে তার নিরন্তর সহযোগিতা ছিল, তখন মানুষ স্বপ্ন দেখেছে পরীর দেশের, মহাকাব্যের যুগে। দার্শনিকের পাষাণের ও জীবন-রসের স্বপ্ন মানুষ দেখেছে। যদিও কোথাও তার সামনে মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হয় নি, তথাপি মানুষ তা হাতড়েছে। মানুষ নিজেকে ক্ষয় করেছে আকাঙ্ক্ষা করেছে ও তার সমস্ত শক্তি দিয়ে মুক্তিস্বর্গে প্রবেশাধিকার প্রার্থনা করেছে। কারণ প্রবৃত্তিবশে মানুষ অনুভব করেছে এই জগৎ তার চূড়ান্ত জগৎ নয়; এবং যদি সে আর-এক জগৎ না পায় তবে তার আত্মা তার কাছে অর্থহীন যন্ত্রণা মাত্র।

প্রকৃতির শাসনের বিরুদ্ধে, মানুষের মুক্তি-বিদ্রোহ বিজ্ঞানের নির্দেশে চালিত হয়। বিজ্ঞান মানুষের হাতে প্রকৃতির ক্ষমতার জাদুদণ্ডটি অর্পণ করার জন্য কাজ করে চলেছে। বস্তুর দাসত্ব থেকে আমাদের আত্মাকে মুক্তি দেবে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের জড়বাদী রূপ আছে। কারণ ধ্বংসস্তূপের মাঝে দাঁড়িয়ে জড়-পদার্থের বন্দীশালা ভাঙার কাজে সে ব্যস্ত। কোনো নতুন দেশের উপর আক্রমণ ঘটলে লুঠতরাজ তখনকার মতো রেওয়াজ হয়ে যায়।

কিন্তু যখন সে দেশ বিজিত হয়, তখন ব্যাপার ভিন্নতর হয়ে যায়, এবং যারা লুঠ করেছিল তারাই পুলিসবাহিনীরূপে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করে। বিজ্ঞান জড়পদার্থের জগৎ আক্রমণের সূচনায় রয়েছে এবং সেখানে সে লুঠতরাজের হিংস্র কাড়াকাড়ি করতে যাচ্ছে। প্রায়ই নানা বস্তুর বিকট জড়রূপটি দেখা যায় এবং তা নির্লজ্জভাবে মানুষের আপন প্রকৃতিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। কিন্তু এমন দিন আসবে যেদিন প্রকৃতির কোনো বড়ো শক্তি প্রতিটি ব্যক্তির আজ্ঞাধীন হবে ও অন্ততঃপক্ষে জীবনধারণের মূল প্রয়োজনগুলি সকলের কাছে অতি সামান্য কষ্ট ও খরচে পৌঁছবে। বেঁচে থাকা মানুষের কাছে শ্বাসগ্রহণের মতোই সহজ হবে এবং তার আত্মা ইচ্ছামত নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করবে।

আদিকালে যখন বিজ্ঞান প্রকৃতির শক্তিভাণ্ডারের চাবিটি খুঁজে পায় নি, তখনো জড়পদার্থের শাসনকে অগ্রাহ্য করার মতো বৈরাগ্যের সাহস মানুষের ছিল। মানুষ বলেছিল যে সে খাদ্য ছাড়াই বাঁচতে পারে এবং চরম শীতাতপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য পরিধেয় তার পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয় নয়। শারীরিক নিগ্রহে মানুষ গর্ব অনুভব করত। প্রকৃতি তার কাছে যে খাজনা দাবি করেছে, তার অতি সামান্যই সে দিয়েছে—এ কথা প্রকাশ্যে ঘোষণায় তার আনন্দ ছিল। যে যন্ত্রণা ও মৃত্যুভয়ের সাহায্যে প্রকৃতি মানুষের গোলামী দাবি করেছে, মানুষ প্রমাণ করেছে যে সেই ভয়কে সে সম্পূর্ণ ঘৃণা করে।

এই গর্ব কেন? শারীরিক প্রয়োজনের কাছে মাথা নিচু করার হীনতার বিরুদ্ধে কেন মানুষ সর্বদাই বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে, প্রকৃতির বিধিনিষেধকে চূড়ান্ত বলে মেনে নেবার ব্যাপারটার সঙ্গে কেন মানুষ নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে নি?

শারীরিক ও নৈতিক জগতে মানুষ কেন কল্পনারোধী অসম্ভবের প্রয়াস করেছে এবং বারবার হতাশা সত্ত্বেও কেন সে কখনো পরাজয়কে মেনে নেয় নি?

প্রকৃতির দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে বলতে হয় মানুষ নির্বোধ। যে জগতে সে বাস করে মানুষ তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না। তার ইতিহাসের সূচনা থেকেই মানুষ এই জগতের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে। সব দিক থেকে সে নিজেকে আঘাত করতে পছন্দ করে বলে মনে হয়। প্রাকৃতিক নির্বাচনের সতর্ক কর্ত্রী কিভাবে তাঁর কাজের মধ্যে গল্‌তি রেখে গেছেন যার মধ্য দিয়ে অনাবশ্যক ও বিপজ্জনক উপাদান তাঁর সংসারে ঢুকে পড়েছে এবং যে জগৎ মানুষকে ধারণ করছে তাকেই ভেঙে ফেলতে তারা মানুষকে প্ররোচনা দিচ্ছে— সে কথা কল্পনা করা কঠিন। মুরগীশাবক যখন তার ছোটো জগতের দেয়ালের মধ্য দিয়ে উঁকি দেয় তখন সে একই ধরণের যুক্তিহীন নির্বোধ কাজ করে। এক অপ্রতিরোধ্য ঝোঁকের বশে শাবকটি ভাবে যে তার খোলার তৈরি প্রিয় বন্দীশালার বাইরে কোনো-কিছু তার জন্য অপেক্ষা করছে। এই অপেক্ষমাণ বস্তু তার অস্তিত্বকে যে পূর্ণতা দেবে, তা সে কখনো কল্পনা করে নি।

একই ভাবে মানুষ প্রবৃত্তিবশে প্রায় অন্ধ নিশ্চিন্ততায় উপনীত হয় যে তার চারপাশের আবরণ যতই ঘন হোক না কেন, প্রকৃতির গর্ভ থেকে আত্মার জগতে সে জন্মগ্রহণ করবেই। সে জগতে মানুষের সৃষ্টির স্বাধীনতা আছে। সেখানে সে অসীমের সঙ্গে সহযোগিতা করে। সেখানে তার সৃষ্টি ও ঈশ্বরের সৃষ্টি ঐক্যচেতনায় মিলিত হয়।

প্রায় সকল ধর্মব্যবস্থায় নৈরাশ্যের একটি বড়ো ক্ষেত্র আছে। সে ক্ষেত্রে জীবনকে মনে করা হয় অসৎ, আর এই জগৎকে ফাঁদ

ও ছলনা মনে করা হয়। সেখানে মানুষ অনুভব করে যে সে তার প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করছে। মানুষ বস্তুপুঞ্জের পীড়ন এত তীব্রভাবে অনুভব করে যে তার মনে হয় এই জগতে একটি অসৎ ব্যক্তিত্ব রয়েছে যা মানুষকে লোভ দেখায়, সব রকম ছলাকলার মধ্য দিয়ে তাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। হতাশায় মানুষ ভাবে যে প্রকৃতির সঙ্গে সর্বপ্রকার যোগাযোগ সে বন্ধ করে দেবে ও একান্তভাবে প্রমাণ করবে যে সে নিজে নিজের পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু তা হল জন্মকালে মায়ের জীবনের সঙ্গে শিশুজীবনের তীব্র বেদনাপূর্ণ শত্রুতা। এটা নিষ্ঠুর ও ধ্বংসমূলক আচরণ। সেই মুহূর্তে তাকে দেখলে মনে হয় ইহা অকৃতজ্ঞতা। সকল ধর্মীয় নৈরাশ্য আসলে খুব পাকা রঙের অকৃতজ্ঞতা। এটা হল— যা এতদিন আমাদের বহন করেছে ও নিজ জীবন দিয়ে আমাদের খাইয়েছে, তাকেই আঘাত করার উন্মত্ত প্ররোচনা।

তথাপি এই যে আপাত-অসম্ভাব্য ব্যাপার রয়েছে, তা আমাদের থামতে ও ভেবে দেখতে বাধ্য করে। এক একটা সময় আসে যখন আমাদের ইতিহাস থেকে আমরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিই ও বিশ্বাস করি যে এই-সব নৈরাশ্যের প্রকোপ এক শ্রেণীর সন্ন্যাসী ও পুরোহিতের সাবধানী সৃষ্টি। তারা বেআইনী অরাজকতার দিনের অস্বাভাবিক পরিবেশে দেখা দেয়। এই বিশ্বাসবলে আমরা ভুলে যাই যে, ষড়্‌যন্ত্র ইতিহাসেরই সৃষ্টি, কিন্তু ইতিহাস কোনো ষড়্‌যন্ত্রের সৃষ্টি নয়। অন্তরের গভীর থেকে মানবপ্রকৃতিতে একদা এই প্রচণ্ড দাবি উঠেছিল যে সে তার নিজের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করুক। এখন যদিও তার প্রচণ্ডতা কমেছে, তথাপি রণহুঙ্কার এখনো সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নি।

আমরা নিশ্চয় জানি কালান্তরের পর্বগুলির নিজস্ব ভাষা আছে, কিন্তু আক্ষরিক অর্থে তা গ্রহণ করা যায় না। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হবার দাবির উপর প্রচণ্ড জোর-দিয়ে মানুষের কাছে আত্মার আবির্ভাব ঘোষিত হল। মনে হল প্রকৃতির বিরুদ্ধে উৎসাদনের লড়াই চালাতে আত্মা উদ্যত হয়েছে। কিন্তু তা হল নেতিবাচক দিক। যখন স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহ দেখা দেয়, তখন তা নৈরাশ্যের রূপ নেয়। তথাপি বিদ্রোহের সত্য তাৎপর্য সরকারের ধ্বংস নয়, সরকারের মুক্তিসাধন।

এই ভাবেই আধ্যাত্মিক জগতে আত্মার আবির্ভাবের তাৎপর্য এই নয় যে আমরা যাকে প্রকৃতি বলি তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদন, বরং সম্পর্কের স্বাধীনতা ও অনুভূতির পূর্ণতা প্রতিষ্ঠাই কাম্য।

জন্মের আগে অন্ধ ও খঞ্জ শিশুর মতোই আমরা প্রকৃতিরাজ্যে অন্ধ ও খঞ্জ হয়ে আছি। কিন্তু অধ্যাত্মজীবনে আমরা মুক্তিতে জন্মগ্রহণ করি। আর তখন আমরা প্রকৃতির অন্ধদাসত্ব থেকে মুক্ত বলে প্রকৃতি আমাদের কাছে আলোকময়ী হয়ে ওঠে এবং যেখানে আগে কেবল আবরণ দেখেছি সেখানে এখন প্রকৃতি-জননীকে দেখি।

কিন্তু মানুষের জীবনে যে স্বাধীনতা এসেছে, তার অন্তিম পরিণতি কি? প্রশ্নাতীত লোকে এই স্বাধীনতার নিশ্চয় কোনো তাৎপর্য আছে। পশুর জীবনের চরম তাৎপর্য কী— এই প্রশ্নের উত্তর যা শুনি, এখানে সেই একই উত্তর শুনতে পাই। আহার গ্রহণ করে ও আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিসাধন করে পশুরা তাদের সত্তাকে অনুভব করে। এবার এই হল শেষ কথা— আমার অস্তিত্ব অনুভব করা। পশু তা জানে, কিন্তু তার জ্ঞান ধোঁয়ার মতো নয়। তা পশুর কাছে অন্ধ অনুভূতিরূপে আসে; তাতে অনুভূতির

আলো নেই। আর যদিচ তা সত্যকে জাগ্রত করে, তাকে তমসাচ্ছন্ন ক'রে রাখে। তা হল অবশিষ্ট সত্তাহীনতা থেকে বিশিষ্ট সত্তায় চেতনার উত্তরণ। নিজেকে কেন্দ্র বলে অনুভব করার মতো বৃত্তপথ এই চেতনার আছে।

মুক্তিরও অন্তিম পরিণতি এই জ্ঞান— 'আমি আছি'। কিন্তু তা হল সত্তার স্বাতন্ত্র্য থেকে মানুষের চেতনার পথচ্যুতি ও সর্বানুভূতির আশ্রয়প্রাপ্তি। নিছক বিস্তারে এই মুক্তি পূর্ণতা লাভ করে না। মুক্তির যথার্থ পূর্ণতা তার তীব্রতায়, তারই নাম ভালোবাসা। মাতৃগর্ভ থেকে শিশুর জন্মলাভে যে মুক্তি, তা তার মায়ের পূর্ণতর চেতনায় সম্পূর্ণতা লাভ করে না; ভালোবাসার মধ্যে মায়ের সম্পর্কে তীব্র চেতনায় তা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। মাতৃগর্ভে এই শিশু আহার ও উত্তাপ পেয়েছিল; কিন্তু তার নিঃসঙ্গতায় শিশুকে সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আত্মতৃপ্ত থাকতে হয়েছিল। জন্মের পর শিশুর মুক্তির মধ্য দিয়ে জননী ও শিশুর মধ্যে ভালোবাসার আন্তর-যোগাযোগ শিশুকে তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণতম চেতনার আনন্দে প্রতিষ্ঠিত করল। শিশুর জগতের সব-কিছুর তাৎপর্য জননীর ভালোবাসায় শিশুটির কাছে উদ্‌ঘাটিত হল। যদি শিশুটি কেবল আহারকারী শারীরযন্ত্র মাত্র হত, তবে তার জগতের মধ্যে শিকড় চালিয়ে দিয়ে শিশুটি বিকশিত হতে পারত। কিন্তু শিশুটি একটি ব্যক্তি, ও তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ উপলব্ধি প্রয়োজন। আর, সে উপলব্ধি কখনোই মাতৃগর্ভের অধীনতায় পাওয়া যেতে পারে না। শিশুকে মুক্ত হতে হবে। তার ব্যক্তিত্বের মুক্তি পূর্ণতা লাভ করবে নিজের মধ্যে নয়, অপর ব্যক্তিত্বের মধ্যে। তা হল ভালোবাসা।

'এ কথা সত্য নয় যে পশুরা ভালোবাসা উপলব্ধি করে না।

কিন্তু সে উপলব্ধি এত দুর্বল যে তা পশুর চেতনাকে সেই স্তরে উদ্দীপ্ত করতে পারে না যেখানে ভালোবাসার পূর্ণ সত্য তাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হবে। তাদের ভালোবাসায় একটা আলোর ছটা আছে, তা তাদের সত্তাকে উজ্জ্বল করে তোলে; কিন্তু তার মধ্যে সেই শিখা নেই যা ব্যক্তিত্বের রহস্যকে অতিক্রম ক'রে যায়। এই আলোর পাল্লা খুব কাছের, তা কেবল ব্যক্তিত্ব নামক আপাত-অসম্ভাব্যের দিকে ইঙ্গিত করে। এই ব্যক্তিত্বই একের নিজস্ব সত্তার ঐক্যোপলব্ধি, অথচ তা অপরের সঙ্গে সম্পর্কের ঐক্যেই যথার্থ সত্যকে লাভ করে।

মানুষকে এই আপাত-অসম্ভাব্য আরো উপলব্ধি করিয়েছে—যে প্রকৃতিতে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, তা নিছক অসম্পূর্ণ সত্য, তা মাতৃগর্ভের সত্যের মতোই অসম্পূর্ণ। বরং পূর্ণ সত্য এই যে, আমরা অনন্ত ব্যক্তিত্বের কোলে জন্মেছি। আমাদের সত্য জগৎ জড়পদার্থ ও শক্তির নিয়মের জগৎ নয়; তা হল ব্যক্তিত্বেব জগৎ। আমরা যখন তা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করি, তখনি আমাদের মুক্তি পূর্ণতা লাভ করে। তখন উপনিষৎ যে-কথা বলেছেন, তা আমরা বুঝতে পারি—

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।

আমরা দেখেছি, সব-কিছু থেকে স্বাতন্ত্র্যের অনুভূতি হল ব্যক্তিত্বের চেতনার সূচনাস্থল, এবং তা সব-কিছুর সঙ্গে ঐক্যানুভূতিতে পরিণতি লাভ করে। এ কথা বলা অনাবশ্যক যে স্বাতন্ত্র্যের চেতনার সঙ্গে অবশ্যই ঐক্যচেতনা থাকবে, কেননা তা কেবল নিজের উপর দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু যে জীবনে স্বাতন্ত্র্যের চেতনা প্রথমে আসে ও ঐক্যচেতনা পরে আসে, ও

সেই কারণে ব্যক্তিত্ব সংকীর্ণ ও সত্যের আলোয় অনুজ্জ্বল— সে জীবন হল ব্যক্তিসত্তার জীবন। কিন্তু যে জীবনে ঐক্যচেতনা মুখ্য উপাদান ও স্বাতন্ত্র্যের চেতনা গৌণ, ও সেই কারণে ব্যক্তিত্বে বিশাল, ও সত্যের আলোয় দীপ্তিমান, সে জীবন হল আত্মার জীবন। মানুষের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হল তার সত্তার ব্যক্তিত্বকে আত্মার ব্যক্তিত্বে মুক্তিদান, তার আন্তর শক্তিগুলিকে সামনের দিকে অনন্তের পথে পরিচালন, আকাঙ্ক্ষায় সত্তার বিরোধিতাকে ভালোবাসায় আত্মার বিস্তৃতিতে রূপান্তর সাধন।

এই ব্যক্তিত্ব একত্বের সচেতন নীতি ও সকল সম্পর্কের কেন্দ্রস্থল,— তাই হল সত্যতা। সে-কারণেই সাধনার পরম লক্ষ্যস্থল। আমি অবশ্যই এই তথ্যের উপর জোর দেব যে, এই জগৎ কেবল একটি কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বের সম্পর্কেই সত্য জগৎ। যখন সেই কেন্দ্র অপসারিত হয়, তখন সেই জগৎ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে, নানা বিমূর্ততার স্তূপে পরিণত হয়। যদি কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তির সঙ্গে জড়পদার্থ, শক্তি, প্রতীক, এমন-কি সত্যের ক্ষীণতম সাদৃশ্যসমূহ— কোনো যুক্তিসঙ্গতি দ্বারা সম্পর্কিত হয়, তবে তার অন্তর্ধানে সব-কিছুই একান্ত শূন্যতায় বিলীন হয়ে যায়।

কিন্তু এই-সব কেন্দ্র অসংখ্য। প্রতি প্রাণীরই আপন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত নিজস্ব ক্ষুদ্র জগৎ আছে। সেইজন্যে স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন ওঠে— এই সত্যতা কি বহু, তারা কি একে অপরের সঙ্গে কোনোমতেই মিলতে পারে না ?

যদি আমাদের ইতিবাচক উত্তর দিতে হয়, তবে আমাদের সমস্ত প্রকৃতি বিদ্রোহ করে। কারণ আমরা জানি যে, আমাদের মধ্যে একত্বের নীতি সকল সত্যতার ভিত্তিভূমি। সুতরাং, সংশয়

ও তর্কবিতর্কের অন্ধকার উষাকাল থেকে তার সকল প্রশ্ন ও কল্পনার মধ্য দিয়ে মানুষ এই সত্যে উপনীত হয়েছে যে, এক অনন্ত কেন্দ্র আছেন যাঁর সঙ্গে সকল ব্যক্তিত্ব, ও সেকারণে সকল সত্যতার জগৎ সম্পর্কবন্ধনে আবদ্ধ। তিনি 'মহান্তং পুরুষম্', এক মহান্ পুরুষ; তিনি 'সত্যম্', এক মহান্ সত্যতা; তিনি 'জ্ঞানম্', তাঁর মধ্যে সকল জ্ঞাতার জ্ঞান রয়েছে, সুতরাং সকল জানার মধ্যে তিনি নিজেকে জানেন; তিনি 'সর্বানুভূঃ', তিনি তাঁর মধ্যে সকল প্রাণীর অনুভূতি অনুভব করেন, সুতরাং সকল অনুভূতির মধ্যে তিনি নিজেকে অনুভব করেন।

কিন্তু সকল সত্যতার কেন্দ্র এই মহান্ পুরুষ নিছক নিষ্ক্রিয়, নেতিবাচক গ্রহণকারী সত্য নন,— 'আনন্দরূপম্ অমৃতম্ যৎ বিভাতি'। তিনি আনন্দ, সকল রূপের মধ্যে নিজেকেই প্রকাশ করেন। তাঁর ইচ্ছাশক্তিতে সকল সৃষ্টি হয়।

আইনের জগতে নয় মুক্তির জগতে, প্রকৃতির জগতে নয় অধ্যাত্মজগতে ইচ্ছাশক্তির পরম দায়িত্ব রয়েছে।

অন্তরের মধ্যে তা আমরা জানি। আমাদের ক্রীতদাসেরা আমাদের আদেশ পালন করে, আমাদের প্রয়োজন মেটায়, কিন্তু তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পূর্ণতা লাভ করে নি। আমাদের ইচ্ছাশক্তির নিজস্ব স্বাধীনতা রয়েছে। তা কেবল অপর ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতায় সত্য সঙ্গতি খুঁজে পায়। যেখানে আমরা আমাদের স্বার্থাকাঙ্ক্ষার দাস, সেখানে আমরা ক্রীতদাসের মধ্যে তৃপ্তি পাই। কারণ ক্রীতদাস আমাদের নিজস্ব দাসত্বের প্রতিফলন মাত্র, তা আমাদের কাছে ফিরে আসে, আমাদের পরনির্ভর ক'রে তোলে। সেই কারণে যখন আমেরিকা তার ক্রীতদাসদের মুক্তি দিয়েছিল, তখন সে নিজেকে মুক্ত করেছিল।

সে মুক্তি কেবল আত্মিক দাসত্ব থেকে নয়, জাগতিক দাসত্ব থেকেও মুক্তি। আমাদের চরম আনন্দ ভালোবাসায়। কারণ সেখানেই আমরা অপরের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করি। বন্ধুদের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতায় আমাদের ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে অপরের ইচ্ছাশক্তির মিলন হয়। সে মিলন অভাব বা ভয়ে বাধ্য হয়ে মিলন নয়। সুতরাং ভালোবাসাতেই আমাদের ব্যক্তিত্ব তার চরম উপলব্ধিকে পায়।

আমাদের ইচ্ছাশক্তির সত্য তার স্বাধীনতায় নিহিত, সুতরাং আমাদের সকল বিশুদ্ধ আনন্দের উৎস স্বাধীনতা। আমাদের প্রয়োজনসাধনে সুখ আছে— কিন্তু এই সুখ নেতিবাচক। কেননা প্রয়োজন একটা বন্ধন, তার পূর্ণতাসাধনেই আমরা তা থেকে মুক্তি পাই। কিন্তু সেখানেই তার সমাপ্তি। সৌন্দর্যে আমাদের যে আনন্দ, তা থেকে এই সুখ ভিন্নতর। এই আনন্দ ইতিবাচক। কারণ যা-ই হোক না কেন, ঐক্যের ছন্দে আমরা পূর্ণতাকে পাই। সেখানে আমরা পদার্থকে দেখি না, আইনকে দেখি না, কিন্তু আমাদের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কোনো-কিছুর সম্পর্ককে দেখি। নিছক রেখা ও জড়পদার্থের বন্ধন থেকে এমন-কিছু বেরিয়ে আসে যা সকল সংকীর্ণ সীমার ঊর্ধ্বে— তা হল সম্পর্কের সম্পূর্ণ ঐক্য। আমরা তৎক্ষণাৎ বিচ্ছিন্ন বস্তুসমূহের অর্থহীনতার পীড়ন থেকে নিজেদের মুক্ত বলে অনুভব করি। এই-সব বস্তু এখন আমাদের এমন-কিছু দেয় যা আমাদের নিজস্ব সত্তার সঙ্গে ব্যক্তি-সম্পর্কে আবদ্ধ। প্রকৃতির মধ্যে আমরা ঐক্যের যে নিষ্ক্রিয় পূর্ণপ্রকাশ লক্ষ্য করি, তা হল সৌন্দর্য। ঐক্যের যে সক্রিয় পূর্ণপ্রকাশ আমরা আত্মিক জগতে লক্ষ্য করি, তা হল ভালোবাসা। তা আনুপাতিক ছন্দে প্রকাশিত হয় না,

নানা ইচ্ছার ছন্দে ধরা পড়ে। মুক্ত ইচ্ছাশক্তি অন্যান্য মুক্ত ইচ্ছাশক্তির মধ্যে অবশ্যই তার ঐক্যের উপলব্ধি খুঁজবে, এবং এই হল আত্মিক জীবনের তাৎপর্য। ব্যক্তিত্বের অসীম কেন্দ্র মুক্তির মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তার আনন্দ বিকিরণ করছে। সেই কেন্দ্র অবশ্যই মুক্তির অন্যান্য কেন্দ্র সৃজন করবে ও তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হবে। নিয়মবদ্ধ বস্তুর মধ্যে ঐক্যের উপলব্ধি হল সৌন্দর্য। মুক্ত ইচ্ছাশক্তির মধ্যে ঐক্যের উপলব্ধি হল ভালোবাসা।

মানুষের মধ্যে এই-সব মুক্তিকেন্দ্র সৃজিত হয়েছে। প্রকৃতির দাক্ষিণ্য গ্রহণ করাই মানুষের কাজ নয়। সে অবশ্যই তার ক্ষমতা-সৃষ্টি ও ভালোবাসার পূর্ণতায় নিজেকে বাইবে বিকীর্ণ করে দেবে। মানুষের গতি অবশ্যই মহান্ পুরুষের অভিমুখে ধাবিত হবে। সেই মহান্ পুরুষের গতিও মানুষের অভিমুখে চালিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক জগৎ ঈশ্বরের নিজস্ব সৃষ্টি, আমরা তাকে কেবল গ্রহণ করতে পারি, ও গ্রহণ করে তাকে নিজের করে তুলতে পারি। কিন্তু আত্মিক জগৎ-সৃষ্টিতে আমরা ঈশ্বরের কাজের অংশীদার। এই কাজে ঈশ্বরকে আমাদের ইচ্ছার সঙ্গে তাঁর ইচ্ছার ঐক্যসাধনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। ক্ষমতার দ্বারা এই আত্মিক জগৎ গড়ে তোলা যায় না। এই জগতের কোনো সুদূরতম কোণে কোনো নিষ্ক্রিয়তা নেই, কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। ছলনার সমস্ত কুয়াশা থেকে চেতনাকে মুক্ত করতে হবে, ইচ্ছাশক্তিকে সকল প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষার বিরোধী শক্তি থেকে মুক্ত করতে হবে, এবং তখন ঈশ্বর যেখানে সৃষ্টি করেন সেখানে তাঁর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হবে। সেখানে কোনো নিষ্ক্রিয় মিলন হতে পারে না— কারণ তিনি নিষ্ক্রিয়

সত্তা নন। তাঁর সঙ্গে আমাদের নিছক উপহার-গ্রহীতার সম্পর্ক সম্পূর্ণ সত্য নয়, কারণ তা একদেশদর্শী এবং সেই কারণে তা অসম্পূর্ণ সম্পর্ক। তিনি তাঁর নিজস্ব পূর্ণতাকে আমাদের দান করেন, আর আমরাও আমাদের প্রাচুর্য থেকে তাঁকে দিই। আর এখানেই সত্য আনন্দ নিহিত, তা কেবল আমাদের জন্য নয়, ঈশ্বরের জন্যও।

আমাদের দেশে বৈষ্ণবেরা এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন ও সাহসের সঙ্গে তা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, ঈশ্বরকে তাঁর ভালোবাসার পূর্ণতার জন্য মানব-আত্মার উপর নির্ভর করতে হয়। ভালোবাসায় অবশ্যই মুক্তি আছে। সুতরাং ঈশ্বরকে অপেক্ষা করতে হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের আত্মা তাদের আপন ইচ্ছামত নিজেদেরকে ঈশ্বরের আত্মার ঐক্যপথে নিয়ে আসে। শুধু তাই নয়, বাধা-বিদ্রোহ থাকলে ঈশ্বরকে যন্ত্রণাও ভোগ করতে হয়।

আত্মিক জগতের সৃষ্টিতে মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ করতে হয়। সে কারণে সেখানে এমন অনেক যন্ত্রণা আছে যার সম্পর্কে পশুর কোনো ধারণা নেই। যখন বাজনার তার বাঁধা হয় তখন বেসুরগুলি তীব্রভাবে বেজে ওঠে, আর প্রায়ই তারগুলি ছিঁড়ে যায়। এই দিক থেকে দেখলে মনে হয় মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে সহযোগিতার কাজটি অর্থহীন ও অপকারী। এই ভাবনার ফলে এই সৃষ্টির হৃদয়কেন্দ্রে প্রতিটি ভুল ও বেখাপ্পা কাজ ছুরিকাঘাতের মতো এসে পড়ে ও তার ফলে আত্মার জগৎ রক্তাক্ত হয় ও যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে। স্বাধীনতা প্রায়শই নেতিবাচক পথ গ্রহণ ক'রে প্রমাণ করতে চায় যে তা হল স্বাধীনতা। আর মানুষ যন্ত্রণা ভোগ করেছে ও ঈশ্বর তার

সঙ্গেই আছেন এইজন্যে যে, এই আধ্যাত্মিক জগৎ অগ্নিস্নান ক'রে উলঙ্গ ও পবিত্র হয়ে দেখা দেবে এবং তার সকল অঙ্গে দিব্য-শিশুর মতো আলোক বিকীর্ণ করবে। এই জগতে শঠতা ও মিথ্যা আছে, নিষ্ঠুর ঔদ্ধত্য ক্ষতমুখে এসে পড়ে, ঈশ্বরের নাম ক'রে মানুষকে অপমান করার অধ্যাত্ম-গর্ব আছে, ও ঈশ্বরকে আপন মিত্র বলে অপমান করে এমন ক্ষমতা-গর্ব আছে। আমরা জানি এই জগতে বহু শতাব্দীর কণ্ঠহারা যন্ত্রণার গুমরে গুমরে কান্না রয়েছে, ও সর্বকালের জন্য শক্তিচ্যুত পঙ্গু অসহায় মানব-সন্তানেরা রয়েছে। এই জগতে দাসত্বের রক্তমাখা ঘর্মবিন্দুতে উর্বর ক্ষেত্রে বিলাসিতার চর্চা হয়েছে, আর দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের উপর সম্পদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, দৈত্যসম নেতিবাচক আত্মা কি জয়যুক্ত হয়েছে? এই আত্মা অনন্তের হৃদয়ে যে যন্ত্রণা সৃষ্টি করেছে, সেখানেই কি তার বৃহত্তম পরাজয় ঘটে নি? আর, পথপ্রান্তের ঘাস ও মাঠের ফুল কি প্রতি মুহূর্তে তার অহঙ্কৃত অস্তিত্ব ও নির্দয় গর্বকে লজ্জা দিচ্ছে না? মানুষ ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কৃত পাপ কি তার মাথায় আপনি শাস্তিস্বরূপ ঘৃণার মুকুট পরিয়ে দিচ্ছে না? হাঁ, মানুষের মধ্যে যে ঐশ্বরিক সত্তা আছে, তা সাফল্য বা সংগঠনকে ভয় করে না। তা বিচক্ষণতা ও শক্তির আয়তনের সতর্কতায় বিশ্বাস করে না। মানুষের মধ্যকার এই ঐশ্বরিক সত্তার শক্তি পেশীতে বা যন্ত্রে নিহিত নয়, কর্মনীতির চাতুর্য বা বিবেকের হৃদয়হীনতাতেও নেই। সে শক্তি আছে তার পূর্ণতার আত্মায়। বাইরের রূপে তা শিশুর মতো অসহায়, কিন্তু রজনীতে তার যন্ত্রণার অশ্রুতে স্বর্গের সব অদৃশ্য শক্তি চলতে শুরু করে, সকল সৃষ্টির মধ্যেকার জননী জাগ্রত হন। বন্দীশালার প্রাচীর ভেঙে পড়ে, সম্পদের রাশি তার

বিরাট অসুন্দর আকৃতির ভারে ধূলিসাৎ হয়। পৃথিবীর ইতিহাস হল ভূমিকম্প বন্যা ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্‌গারের ইতিহাস। তথাপি এই-সবের মধ্য দিয়ে তা শ্যামল প্রান্তর ও নৃত্যপর নদীর ইতিহাস, সৌন্দর্য ও উচ্ছল জীবনের ইতিহাস। মানুষের ও ঈশ্বরের জীবন দিয়ে গড়া আধ্যাত্মিক জগৎ তার অসহায় পতন ও আঘাতের শৈশবকাল অতিক্রম ক'রে যাবে, এবং এক দিন তার যৌবনের শক্তিতে সোজা হয়ে দাঁড়াবে, আপন সৌন্দর্যে ও গতির স্বাধীনতায় আনন্দিত হবে।

আমাদের বৃহত্তম আশা এইখানে যে, জগতে দুঃখ-যন্ত্রণা রয়েছে। তা হল অপূর্ণতার ভাষা। তার সব উক্তিতেই পূর্ণতার প্রতি তার বিশ্বাস ব্যক্ত হয়। এ যেন শিশুর কান্না; যদি মায়ের প্রতি তার বিশ্বাস না থাকত তবে সে কান্না হত মূক। এই যন্ত্রণা মানুষকে তার মধ্যে যে অনন্ত ঈশ্বব রয়েছেন, প্রার্থনাব দ্বারা তার রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করার প্রেরণা দেয়। এই ভাবে আদর্শের সত্যতায় মানুষের গভীরতম প্রবৃত্তি, তাব যুক্তিহীন আস্থা ব্যক্ত করে। মৃত্যুর জন্য সদাপ্রস্তুতিতে, আপন সত্তার সব-কিছু বর্জনে এই আস্থা প্রকাশিত হয়। আত্মদানের স্রোতোধারায় ব্যক্ত ঈশ্বরের জীবন মানুষের জীবনকে স্পর্শ করেছে; আর মানুষের জীবনও তার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বিশ্বমুখী হয়েছে। যখনি অনৈক্যের সুর বেজে ওঠে, তখনি মানুষ কাতর প্রার্থনা করে, 'অসতো মা সদগময়'— আমাকে অসত্য থেকে সত্যের পথে যেতে সাহায্য করো। এই প্রার্থনা হল আত্মার মহান্ সংগীতের সুরে সুর মেলাবার জন্য মানুষের সত্তার আত্মসমর্পণ। এই আত্মসমর্পণেব জন্য প্রতীক্ষা ছিল, কেননা মুক্তি ব্যতীত আধ্যাত্মিক ঐক্য সক্রিয় হয় না। সুতরাং অনন্তের কাছে মানুষের স্বেচ্ছা-আত্মসমর্পণ হল মিলনের সূচনা। কেবল

তখনি মুক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের ভালোবাসা মানব-আত্মার উপর পূর্ণভাবে ক্রিয়া করতে পারে। এই আত্মসমর্পণ হল ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের আত্মার জীবনের স্বেচ্ছা-সহযোগিতা। নিয়মের জগৎকে প্রেমের জগতে রূপান্তরিত করার সাধনার ক্ষেত্রেই এই সহযোগিতা।

মানুষের ইতিহাসে এমন-সব মুহূর্ত এসেছে যখন ঈশ্বরের জীবন-সংগীত পরিপূর্ণ সঙ্গতিতে মানবজীবনকে স্পর্শ করেছে, এবং সে সংগীত আমরা শুনেছি। আমরা জেনেছি যে, মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা প্রকাশিত হয় আপন ক্ষেত্রে ঈশ্বরের প্রকৃতি গ্রহণে ও ভালোবাসার প্রাচুর্যে আত্মদানে। মানুষ এই প্রকৃতির জগতে নানা মানবিক বাধা ও ক্ষুধা নিয়ে জন্মেছে। তথাপি মানুষ প্রমাণ করেছে যে সে অধ্যাত্ম জগতে নিঃশ্বাস নিয়েছে, এবং সর্বাপেক্ষা বড়ো সত্য হল এই যে ভালোবাসার পূর্ণ মিলনেই ব্যক্তিত্বের মুক্তি। মানুষ নিজেকে সকল স্বার্থ-আকাজ্ক্ষা থেকে মুক্ত করেছে, জাতি ও জাতীয়তাবোধের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করেছে, ভয় এবং মতবাদ ও প্রথার দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছে। অনন্তের সঙ্গে মুক্ত সক্রিয় জীবনের যোগে ও ত্যাগের সীমাহীন প্রাচুর্যে মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়েছে। মানুষ দুঃখ পেয়েছে ও ভালোবেসেছে। জগতের সকল অসতের আঘাত মানুষ বুক পেতে নিয়েছে ও প্রমাণ করেছে যে, আত্মার জীবন মৃত্যুহীন। কত বিশাল রাজ্য তাদের আকৃতি বদ্‌লেছে ও মেঘের মতো অদৃশ্য হয়ে গেছে, কত প্রতিষ্ঠান স্বপ্নের মতো আকাশে বিলীন হয়ে গেছে, কত জাতি তাদের কাজ করেছে ও বিস্মৃতিতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে ; কিন্তু এই-সব ব্যক্তি তাদের মধ্যে সকল মানুষের মৃত্যুহীন জীবনকে বহন করে চলেছে। তাদের বিরামহীন জীবন প্রবল বন্যাবেগে নদীর মতো কত শ্যামল প্রান্তর ও

মরুভূমির মধ্য দিয়ে, কত দীর্ঘ অন্ধকার বিস্মৃতির গভীর খাদের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে এবং সুর্যালোকের নৃত্যপর আনন্দলোকে উপনীত হয়েছে। এই জীবনধারা অন্তহীন কালের মধ্য দিয়ে বহু মানবের দ্বারে জীবন-বারি পৌঁছে দিয়েছে, তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করেছে, দৈনন্দিন ধূলিময় জীবনের অপবিত্রতাকে নির্মল করেছে, এবং হট্টগোলের মধ্য দিয়ে চিরকালের জীবনের সংগীত জীবন্ত কণ্ঠে গেয়েছে; সে সংগীতের ভাষা এই—

এষাস্য পরমা গতিঃ
এষাস্য পরমা সম্পৎ।
এষোঽস্য পরমো লোকঃ
এষোঽস্য পরম আনন্দঃ॥

আমার বিদ্যালয়

যখন আমার বয়স প্রায় চল্লিশ, তখন বাংলাদেশে আমি একটি বিদ্যালয় খুলেছিলাম। অবশ্যই আমার মতো ব্যক্তি যে জীবনের বড়ো অংশ লিখে, প্রধানতঃ কবিতা রচনা ক'রে কাটিয়েছে, তার কাছ থেকে তা কখনোই আশা করা হয় নি। সুতরাং স্বভাবতই লোকে এ কথা ভেবেছিল যে, বিদ্যালয় হিসেবে এটা খুব ভালো-কিছু হবে না, বরং দুঃসাহসিক অনভিজ্ঞতার ফলরূপে এটি একেবারেই নতুন-কিছু হবে।

এই হল অন্যতম কারণ— যার জন্য আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করা হয় কোন্ আদর্শের ভিত্তিতে আমার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। আমার পক্ষে প্রশ্নটি খুবই বিব্রতকর, কারণ আমার প্রশ্নকারীদের খুশি করার জন্যে আমি আমার উত্তরে সাধারণ কথা বলতে পারি না। যাই হোক, মৌলিক কিছু হবার লোভ সংবরণ ক'রে আমি নিছক সত্যনিষ্ঠ হয়েই তৃপ্ত থাকব।

প্রথমতঃ, আমি অবশ্যই স্বীকার করব যে কোন্ আদর্শের ভিত্তিতে আমার বিদ্যালয় গঠিত, তা ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে কঠিন। কারণ যার উপরে একটা বাড়ি গড়ে তোলা যায়, তেমন কোনো স্থায়ী ভিত্তিপ্রস্তরের মতো এই আদর্শ স্থায়ী নয়। এই আদর্শ বরং একটা বীজের মতো, তাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, ও কোন্খানে বীজ গাছে পরিণত হতে শুরু করেছে তা দেখানো যায় না।

যে উৎসের কাছে এই বিদ্যালয় ঋণী, সে যে কী ছিল, তা আমি জানি। সেটি শিক্ষার কোনো নতুন তত্ত্ব নয়, বরং তা হল আমার বিদ্যালয়-জীবনের স্মৃতি।

সেই দিনগুলি যে আমার পক্ষে সুখের হয় নি, তার জন্যে আমি আমার বিশিষ্ট মেজাজকে দায়ী করি না, বা যে-সব বিদ্যালয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছিল, তাদের বিশেষ কোনো দোষ ছিল, তা-ও বলি না। এটা হওয়া সম্ভব ছিল যে যদি আমি কিছু কম অনুভূতিপ্রবণ হতাম, তবে আমি ধীরে ধীরে নিজেকে চাপের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারতাম, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অর্জনের মতে উপযুক্ত কাল টিঁকে যেতাম। কিন্তু বিদ্যালয় হল বিদ্যালয়, যদিও তাদের নিজ আদর্শ অনুযায়ী কোনোটা ভালো, কোনোটা অপেক্ষাকৃত মন্দ।

শিশুরা তাদেব মাতৃস্তন্যে পালিত হবে, এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারা একই সময়ে তাদের খাদ্য ও তাদের জননীকে পায়। তা শিশুদেব শরীর ও আত্মার পক্ষে সম্পূর্ণ খাদ্য। জগতের সঙ্গে মানুষের সত্য সম্পর্ক কার্যকারণের যান্ত্রিক নিয়মের উপর নয়, ব্যক্তিগত ভালোবাসার উপরেই প্রতিষ্ঠিত—এই মহান্ সত্যের সঙ্গে শিশুদের প্রথম পরিচয় এখানেই ঘটে।

কোনো গ্রন্থেব সূচনা ও উপসংহারের একই ধরণের বৈশিষ্ট্য আছে। উভয় ক্ষেত্রেই সত্যের সম্পূর্ণ রূপটি দেওয়া হয়। সূচনায় তা সরল, কেননা তা ব্যাখ্যাত নয়, আর উপসংহারে তা পুনবায় সরল হয় কেননা সেখানে তা পূর্ণরূপে ব্যাখ্যাত। সত্যের একটি মধ্যপথ আছে, সেখানে তা জটিল হয়ে ওঠে, বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে নিজেকে আঘাত করে, টুকরো টুকরো হয়ে নিজেকে ভেঙে ফেলে, পূর্ণতর ঐক্যের উপলব্ধিতে নিজেকে ফিবে পায়।

একই ভাবে এই জগতের সঙ্গে মানুষের প্রথম পরিচয় হচ্ছে—তার চূড়ান্ত সত্যের সঙ্গে মানুষের প্রথম সরল পরিচয়। মানুষ এই জগতে জন্মায়, জগৎ তার কাছে গভীরভাবে জীবন্ত। এখানে

মানুষ ব্যক্তিরূপে তার পরিবেশের পূর্ণ মনোযোগ অধিকার করে। তারপরে সে বড়ো হয় ও বাস্তবতার এই একান্ত ব্যক্তিগত দিকটিকে সন্দেহ করতে শুরু করে। তখন মানুষ বস্তুর জটিলতায় নিজেকে হারায়, তার পরিবেশ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়, ও প্রায়ই শত্রুভাবাপন্ন হয়। কিন্তু সত্যের ঐক্যবোধের এই ভাঙন, মানুষের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তার বাইরেব জগতের আপোসহীন গৃহযুদ্ধ— এই-সব কখনোই অন্তহীন বিবাদের মধ্যে ঐক্যকে খুঁজে পাবে না। তার ফলে তার জীবনের সত্য উপসংহার খুঁজে পাবার জন্য মানুষকে সংশয়ের বিচ্যুতির মধ্য দিয়ে পূর্ণ সত্যের সারল্যে ফিরে আসতে হয়, সব-কিছুর সঙ্গে তার ভালোবাসার ঐক্যবন্ধনে ফিরে আসতে হয়।

সুতরাং (আমাদের শৈশবকে জীবনতৃষ্ণার পূর্ণ পরিমাণ দেওয়া প্রয়োজন, কারণ তার অন্তহীন তৃষ্ণা রয়েছে। চারপাশের জগতের সঙ্গে এই মানবিক জগতের সঙ্গতি রয়েছে— এই ধারণায় শিশুমন সিক্ত হওয়া প্রয়োজন। আর ঠিক এই ব্যাপারটাই আমাদের প্রচলিত ধরণের বিদ্যালয় উচ্চতর জ্ঞানের অহমিকায় নিষ্করুণভাবে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে অগ্রাহ্য করে। ঈশ্বরের আপন সৃষ্টির রহস্যময় ও ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনাপূর্ণ জগৎ থেকে এই বিদ্যালয় জোর ক'রে শিশুদের ছিনিয়ে নিয়ে আসে। এই বিদ্যালয় নিছক শৃঙ্খলা-রক্ষার প্রক্রিয়া মাত্র, তা ব্যক্তিকে বিবেচনা করতে রাজী নয়। এটা হচ্ছে এক ছাঁচের ফলাফলের জন্য বিশেষভাবে তৈরি কারখানা। এই বিদ্যালয় শিক্ষার খাত খননের জন্য গড় হিসেবের একটা কল্পিত সরল রেখা অনুসরণ করে। কিন্তু জীবনের রেখা সরল রেখা নয়, কারণ জীবন গড় হিসেবের রেখা নিয়ে এদিক-ওদিক খেলতে ভালোবাসে এবং সে কারণে বিদ্যালয়ের ভৎর্সনাকে মাথা

পেতে নেয়। কারণ বিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী জীবন তখনি পূর্ণ বলে বিবেচিত হয় যখন জীবন নিজেকে মৃত বলে ব্যবহারের সুযোগ দেয়, সুষম সুবিধায় নিজেকে কেটে ফেলতে দেয়। আমাকে যখন বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছিল তখন আমি এই কারণেই যন্ত্রণা ভোগ করেছিলাম। কারণ হঠাৎ আমি দেখলাম আমার চার দিকে আমার জগৎ বিলীন হয়ে যাচ্ছে, আর কাঠের বেঞ্চি ও সমতল দেয়ালগুলি আমার দিকে অন্ধের শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমি বিদ্যালয়-শিক্ষকের হাতে-গড়া বস্তু নই— আমি যখন এই জগতে জন্মেছি তখন সরকারী শিক্ষাপর্ষদের সঙ্গে পরামর্শ করা হয় নি। কিন্তু আমার সৃজনকর্তার এই ভুলের জন্য তারা আমার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, এটা কি কোনো যুক্তি হল?

কিন্তু প্রবাদবাক্য বলে যে, জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেলে আর স্বর্গে বাস করা যায় না। সুতরাং মানবশিশুদের স্বর্গ থেকে এক মৃত্যুরাজ্যে নির্বাসিত করতে হবে; সে রাজ্যে দর্জির রুচিরই প্রাধান্য। সেই কারণে আমার মনকে বিদ্যালয়ের আঁট-সাঁট খাপের শাসনকে স্বীকার করে নিতে হল। সেই খাপ চীনা মান্দারিন-রমণীদের জুতোর মতো আমার প্রকৃতিকে সব দিক থেকে প্রতি মুহূর্তে খোঁচাতে লাগল ও আহত করল। আমি সৌভাগ্য-বান যে পাগলামি চেপে বসার আগেই আমি তা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিলাম।

আমার সামাজিক পর্যায়ের ব্যক্তিদের সংস্কৃতিবান সমাজের অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য যে শাস্তি ভোগ করতে হত, যদিও তার পুরোটা আমাকে ভোগ করতে হয় নি, তথাপি আমি খুশি যে এই পীড়ন থেকে আমি সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি পাই নি। কারণ

মানবশিশুরা যে অন্যায় যন্ত্রণা ভোগ করে, তার জ্ঞান আমি এই পীড়ন থেকেই পেয়েছি।

এর কারণ হচ্ছে এই— শিশুরা কী ভাবে জ্ঞানের রাজ্যে বেড়ে উঠবে, সে বিষয়ে মানুষের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যায়। আমাদের কাজকর্ম কী ভাবে চালাবো, তা আমাদের নিজেদের ব্যাপার, আর সেই কারণে আপিসে আমাদের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের স্বাধীনতা আমাদের আছে। কিন্তু এই ধরণের আপিসী বন্দোবস্ত ঈশ্বরের সৃষ্টিতে খাপ খায় না। আর শিশুরা হচ্ছে ঈশ্বরের নিজস্ব সৃষ্টি।

এই জগতে আমরা এসেছি একে গ্রহণ করব বলে। নিছক এই জগৎকে জানতে আমরা আসি নি। জ্ঞানের দ্বারা আমরা শক্তিমান হতে পারি, কিন্তু সহানুভূতির দ্বারা আমরা পূর্ণতাকে পাই। উচ্চতম শিক্ষা আমাদের কেবল সংবাদ দেয় না, সকল অস্তিত্বের সঙ্গে আমাদের জীবনের ঐক্য রচনা করে। কিন্তু আমরা দেখি এই সহানুভূতির শিক্ষা বিদ্যালয়গুলিতে কেবল রীতিমাফিক অগ্রাহ্য করাই হয় না, সেই সঙ্গে তাকে কঠোরভাবে দমন করা হয়। আমাদের নিতান্ত শৈশব থেকে অভ্যাস গড়ে ওঠে, এবং জ্ঞান এমনভাবে দেওয়া হয় যাতে আমাদের জীবন প্রকৃতি থেকে দূরে সরে যায়; এবং আমাদের জীবন-সূচনা থেকে আমাদের মন ও জগৎকে পরস্পরের বিরুদ্ধে স্থাপনা করা হয়। এই ভাবে যে মহত্তম শিক্ষার জন্য আমরা প্রস্তুত হয়ে আসি, তাকে অবহেলা করা হয়। আর একঝুড়ি সংবাদ সঞ্চয়ের জন্য আমাদের জগৎকে হারাতে আমাদের বাধ্য করা হয়। আমরা শিশুকে ভূগোল শেখাবার জন্য তার জগৎকে সরিয়ে দিই, ও ব্যাকরণ শেখাবার জন্য তার ভাষা হরণ করি। শিশুর তৃষ্ণা

মহাকাব্যের জন্য, কিন্তু তাকে তথ্য ও তারিখের তালিকা সরবরাহ করা হয়। শিশু মানবজগতে জন্মায়, কিন্তু তাকে জীবন্ত গ্রামোফোনের জগতে নির্বাসিত করা হয়। এই নির্বাসন হল অজ্ঞতার জগতে জন্মগ্রহণরূপ আদিম পাপের প্রায়শ্চিত্ত। শিশুর প্রকৃতি এই শোচনীয় দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে তার সমস্ত যন্ত্রণার শক্তি দিয়ে প্রতিবাদ করে; শেষ পর্যন্ত তা শাস্তির পীড়নে নীরব হয়ে যায়।

আমরা সবাই জানি, শিশুরা ধুলো ভালোবাসে; তাদের সমস্ত শরীর ও মন সূর্যালোক ও বাতাসের তৃষ্ণায় ফুলের মতোই কাতর হয়। বিশ্বজগৎ থেকে তাদের ইন্দ্রিয়গ্রামের কাছে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপনের জন্য যে নিরন্তর আমন্ত্রণ এসে পৌঁচচ্ছে, শিশুরা কখনোই তাকে প্রত্যাখ্যান করে না।

কিন্তু শিশুদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের মাতাপিতারা বৃত্তির অনুসরণে সামাজিক প্রথানুযায়ী তাদের অভ্যাসের বিশেষ জগতে বাস করে। এই জগতের বেশির ভাগের সঙ্গেই কোনো সহযোগিতা করা যায় না। কারণ পরিবেশের তাড়নায় ও সামাজিক সমতার প্রয়োজনে মানুষকে কোনো একটা বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হতে হয়।

কিন্তু আমাদের শৈশব হচ্ছে সেই সময় যখন আমাদের আরো বেশি স্বাধীনতা থাকে বা থাকা উচিত। সে স্বাধীনতা হচ্ছে—সামাজিক ও বৃত্তিগত প্রথাবদ্ধতার সংকীর্ণ সীমায় বিশেষ জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন থেকে মুক্তি।

আমার বেশ মনে পড়ছে কড়া শাসনকারী বলে খ্যাতিমান এক অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক মশায় কী রকম বিস্মিত ও বিরক্ত হয়েছিলেন যখন তিনি দেখলেন, আমার বিদ্যালয়ের একটি ছেলে

একটি গাছে চড়ে বসেছে ও একটি শাখার দ্বিধাবিভক্ত স্থানে বসে লেখাপড়ার আয়োজন করছে। এই ঘটনাটির ব্যাখ্যাস্বরূপ আমি তাঁকে বলেছিলাম যে— শৈশব-ই জীবনের একমাত্র সময় যখন সভ্য মানুষ বৈঠকখানার চেয়ারে বসবে, না, গাছের শাখায় বসবে, তা পছন্দ করতে পারে; আর বয়স্ক ব্যক্তি হিসেবে আমি এই অধিকারবঞ্চিত বলে আমার পক্ষে কি এই ছেলেটিকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত হবে? আশ্চর্যের বিষয়, সেই একই প্রধান শিক্ষক মশায় ছেলেদের উদ্ভিদ্‌বিদ্যাশিক্ষা অনুমোদন করেন। গাছের সম্পর্কে অ-ব্যক্তিগত জ্ঞানলাভে তাঁর আস্থা আছে, কারণ তা হল বিজ্ঞান। কিন্তু গাছের সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় তাঁর আস্থা নেই। অভিজ্ঞতার এই বৃদ্ধির ফলে প্রবৃত্তি দেখা দেয়। এই প্রবৃত্তি হল প্রকৃতির নিজস্ব শিক্ষাপদ্ধতি। আমার বিদ্যালয়ের ছেলেরা উদ্ভিদের শারীরতত্ত্ব সম্পর্কে প্রবৃত্তিগত জ্ঞান আহরণ করেছে। আপাততঃ দুরারোহ গাছের গুঁড়ির কোন্‌খানে পা রাখার জায়গা পাওয়া যাবে, তা ছেলেরা সামান্য স্পর্শের দ্বারাই জানতে পারে। তারা জানে গাছের শাখার 'পরে কতটা নির্ভর করা যায়, প্রশাখাগুলিকে ব্যতিব্যস্ত না ক'রে দেহভার কী ভাবে রাখা যায়। ফলসংগ্রহ, বিশ্রামগ্রহণ ও অবাঞ্ছিত পশ্চাদ্ধাবনকারীর হাত এড়িয়ে আত্মগোপনের কাজে গাছকে ছেলেরা ভালোভাবেই কাজে লাগাতে পারে। আমি নিজে শহরের অভিজাত ঘরে লালিত হয়েছি। আর সেখানে আমার ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে আমি সারা জীবন ধরে এমনভাবে চলাফেরা করতে অভ্যস্ত হয়েছি যে মনে হয় সে জগতে গাছের কোনো অস্তিত্ব নেই। সুতরাং আমি মনে করি, আমার ছেলেদের শিক্ষার একটা অঙ্গ হবে এই যে, তাদের অস্তিত্বের পরিকল্পনায় গাছের একটি বিশেষ

ভূমিকা থাকবে। সেখানে গাছ কেবল ক্লোরোফিল উৎপাদন ও বাতাস থেকে কার্বন গ্রহণ করে না, বরং জীবনীশক্তিসমৃদ্ধ গাছ রূপেই দেখা দেয়।

(স্বভাবতই আমাদের পদতল এমনভাবে নির্মিত যে এই পৃথিবীর উপরে দাঁড়াবার ও হেঁটে যাবার পক্ষে তা শ্রেষ্ঠ যন্ত্র হয়েছে। যেদিন থেকে আমরা জুতো পরতে শুরু করেছি, সেদিন থেকেই আমরা আমাদের পায়ের উপযোগিতাকে খুব কমিয়ে ফেলেছি। পায়ের দায়িত্ব কমে যাবার ফলে তাদের মর্যাদা নষ্ট হয়ে গেছে। আর এখন আমাদের পা মোজা, চটি ও সবরকম দামের ও বিরূপ আকৃতির জুতোয় শোভিত হচ্ছে। আমাদের কাছে এই সজ্জা হল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ যে— তিনি আমাদের খুরের বদলে সুন্দর অনুভূতিশীল পদতল দিয়েছেন।

আমি অবশ্য বয়স্ক মানুষেব জীবন থেকে পদাবরণকে একেবারে বাদ দেবার পক্ষে নই। কিন্তু আমি বিনা দ্বিধায় জোর দিযে বলব যে, শিশুদের পদতলকে তাদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়, কারণ সে শিক্ষা বিনামূল্যে প্রকৃতি তাদের দিয়েছে। আমাদের সকল অঙ্গের মধ্যে এই পাদাঙ্গই পৃথিবীকে স্পর্শের দ্বারা জানার পক্ষে সব চেয়ে উপযোগী। কারণ এই পৃথিবীর সত্য প্রেমিক-পদতলের চুম্বনেই উদ্ঘাটিত হয়।)

আমি আবার স্বীকার কবছি যে, আমি এক অভিজাত ঘবে লালিত হয়েছি ও শৈশব থেকে ধুলোর প্রত্যক্ষ সংযোগ থেকে আমার পা-কে সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে। যখন আমি ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খালি পায়ে হাঁটবার চেষ্টা করেছি, তখন আমি বেদনার সঙ্গে অনুভব করেছি যে আমার পায়ের তলার পৃথিবী সম্বন্ধে আমি কত অজ্ঞ। আমি অবধারিত কাঁটার উপর দিয়েই

হেঁটে গিয়েছি, তার ফলে কাঁটা পায়ে ফুটেছে। ন্যূনতম বাধার পথ অনুসরণ ক'রে চলার মতো প্রবৃত্তি আমার নেই। কারণ অতি সমতল মাটিতেও ছোটো ছোটো ঢেলা খানাখন্দ, উঁচু-নীচু আছে। কেবল শিক্ষিত পা তাদের পার্থক্য ঠিক বুঝতে পারে। নিখুঁত প্রান্তরের মধ্য দিয়ে যে অযৌক্তিক আঁকাবাঁকা পায়ে-চলা পথ গিয়েছে, তা দেখে আমি অনেক সময় অবাক হয়েছি। যখন আপনি বিবেচনা করেন যে, এই পায়ে-চলা পথ কোনো একজনের খেয়ালখুশিতে তৈরি হয় নি, তখন আরো বিস্মিত হতে হয়। যদি অধিকাংশ পথিকের একই ধরণের খামখেয়াল না থাকত, তবে স্পষ্টতই এই ধরণের অসুবিধাজনক পথ তৈরি হতে পারত না। কিন্তু আসলে দায়ী হচ্ছে ধরাতলের নানা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত। আমাদের পদতল সে ইঙ্গিতে অজান্তে সাড়া দেয়। যাদের ক্ষেত্রে ঐ ধরণের সাড়া নষ্ট হয়ে যায় নি, তারা তাদের পায়ের পেশীকে ন্যূনতম ইঙ্গিতমাত্রেই দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে পারে। সুতরাং কাঁটার উপর দিয়ে চলাফেরা করলেও তারা নিজেদের কাঁটার ঘা থেকে বাঁচাতে পারে, ও বন্ধুর পথে কিছুমাত্র অসুবিধা বোধ না করেই খালি পায়ে হেঁটে যেতে পারে। আমি জানি কাজের জগতে জুতো পরা হবে, রাস্তা বাঁধানো হবে, গাড়ি ব্যবহার করা হবে। কিন্তু এই জগতের সবটাই বৈঠকখানা নয়, প্রকৃতি নামে একটি ক্ষেত্র আছে যেখানে শিশুদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুন্দরভাবে সাড়া দেবার জন্য তৈরি হয়েছে— এই জ্ঞান কি শিক্ষাকালে শিশুদের দেওয়া হবে না?

এমন অনেকে আছেন যাঁরা মনে করেন আমার বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত সরল জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে আমি মধ্যযুগীয় দারিদ্র্যের আদর্শ প্রচার করছি। এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আমার আজকের বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু শিক্ষার দৃষ্টি থেকে দেখলে

আমরা কি এ কথা স্বীকার করব না দারিদ্র্যের বিদ্যালয়েই মানুষ তার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ পাঠ নেয়?

এমন-কি ক্রোড়পতির পুত্রকেও অসহায় হয়ে জন্মাতে হয় ও গোড়া থেকেই তার জীবনের পাঠ নিতে হয়। যদিও পায়ের সাহায্য ছাড়াই চলাফেরার আবশ্যকীয় সঙ্গতি তার আছে, তথাপি দরিদ্রতম শিশুর মতোই তাকে হাঁটতে শিখতে হয়। ধনী হয়ে বাঁচার অর্থ পরিবর্ত জীবনধাবণ, ও কিছুটা পরিমাণ কম বাস্তবতার জগতে জীবনধারণ। একজনের সুখ ও গর্ব প্রকাশের পক্ষে এই প্রথা ভালো। কিন্তু শিক্ষালাভের পক্ষে ভালো নয়। সম্পদ নামক সোনার খাঁচায় ধনী-সন্তানেরা তাদের শক্তির কৃত্রিম নিরাকরণের মধ্যে লালিত হয়। সুতরাং খরচে অভ্যাসের লোকেদের বিরক্তি সত্ত্বেও আমার বিদ্যালয়ে আমি এই মহৎ শিক্ষককে—আসবাব ও নানা বস্তুর রিক্ততাকে—আহ্বান করেছি। দারিদ্র্যের কারণে নয়, এই রিক্ত জীবনযাত্রা আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জগতে পৌঁছে দেয়, এই কারণেই আমি তাকে স্বাগত জানিয়েছি।

আমি বলতে চাই, একটা সীমাবদ্ধ পর্বে মানুষ আদিম মানুষের জীবনযাত্রাকে গ্রহণ করে। সভ্য প্রতিষ্ঠানগুলি অজাত শিশুর জীবনকে বদলাবার সুযোগ পায় নি। মাতৃগর্ভে তার বৃদ্ধিশীল জীবনের প্রথম স্তর সম্পূর্ণ করার মতো অবসর এই অজাত শিশুর আছে। পরবর্তী স্তরে প্রাকৃতিক জীবন যাপনের জন্য তৈরি সকল প্রবৃত্তি নিয়ে যখন সে জন্মায়, তখনি সভ্য-অভ্যাসের সমাজ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, এবং শিশুকে পৃথিবী, জল বায়ু, সূর্যালোক ও আকাশের ব্যাকুল আমন্ত্রণ থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়। প্রথম দিকে শিশু লড়াই করে, কান্নার তীব্র আপত্তি জানায়, এবং ক্রমশঃ ভুলে যায় যে ঈশ্বরের সৃষ্টির উত্তরাধিকার তার ছিল। তারপর

এই শিশু তার জগতের জানালা বন্ধ করে, পর্দা টেনে দেয়, অর্থহীন হিজিবিজির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, এবং তার জগৎ ও সম্ভবতঃ তার আত্মার মূল্যে যা সঞ্চয় করেছে তার জন্য গর্ব অনুভব করে।

নানা প্রথা ও বস্তুর সভ্যজগৎ মানুষের অগ্রগতির মাঝপথে এসে দাঁড়ায়। এই জগৎ না রয়েছে সূচনায়, না রয়েছে শেষে। এই জগতে অসংখ্য জটিলতা ও শিষ্টতার নানা আইন ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যখন এই জগৎ এ গুলিকে শেষ কথা বলে মেনে নেয়, ও মানুষের জীবনে ধোঁয়া ও হট্টগোলের মধ্যে কোনো সবুজের ছোঁয়া আর থাকে না ও ঢেকে-রাখা সাজানো ঔচিত্যবোধ বড়ো হবে বলে স্থির করে, তখন শিশুরা কষ্ট পায়, তরুণদের মনে জগৎ সম্পর্কে নৈরাশ্য দেখা দেয়, এবং বুড়োরা শান্তি ও সৌন্দর্যে বাধক্যে পৌঁছতে ভুলে যায়, বিকৃত যুবক হয়ে পড়ে, ও খানাখন্দ-ভরা বাধক্যজীবনের শৈথিল্যের জন্য লজ্জা পায়।

যাই হোক, এ কথা নিশ্চিত যে যখন শিশুরা এই জগতে জন্মাবার জন্যে তৈরি, তখন তারা ক্ষত-বিক্ষত ভদ্রতার জন্য দরাদরি করে না। যদি তারা জানত যে সূর্যালোকে যখন তারা চোখ মেলবে, তখন নিজেদের মনের নবীনতা ও ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তারা শিক্ষা বিভাগের হাতে বন্দী হবে; তবে মানবজীবন শুরু করার আগে শিশুবা নিশ্চয়ই দুবার ভেবে দেখত। ঈশ্বরের ব্যবস্থা কখনোই উদ্ধতভাবে বিশেষ রকমের ব্যবস্থা নয়। সর্বদাই সব-কিছুর সঙ্গে তাদের বিরতিহীন সম্পর্ক ও সমগ্রতার সংগতি রয়েছে। সুতরাং (আমার ছাত্রজীবনে যা আমাকে যন্ত্রণা দিয়েছে, তা হল বিদ্যালয়ে এই জগতের সমগ্রতার অনুপস্থিতি।) বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা হল পাঠশিক্ষার বিশেষ

ব্যবস্থা। যে বয়স্ক মানুষ বিদ্যালয়ের বিশেষ প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত ও সে-কারণে জীবন থেকে সম্পর্কচ্যুতির মূল্যে শিক্ষা গ্রহণে প্রস্তুত, তারই উপযোগী এই শিক্ষালয়। কিন্তু শিশুরা জীবনের প্রেমে আবদ্ধ, আর তা তাদের প্রথম প্রেম। জীবনের সব রঙ ও গতি শিশুদের ব্যগ্র মনোযোগ আকর্ষণ করে। এই প্রেমকে রুদ্ধ করা কি আমাদের পক্ষে উচিত হচ্ছে? শিশুরা সন্ন্যাসী হয়ে জন্মায় না। জ্ঞানলাভের জন্য এখুনি মঠের শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনে প্রবেশের যোগ্যতা শিশুদের নেই। গোড়ায় প্রেমের জীবনের মধ্য দিয়ে শিশুরা জ্ঞান সঞ্চয় করবে, ও তার পরে জ্ঞান-সংগ্রহের জন্য তারা জীবন ত্যাগ করবে, এবং তার পরে আবার পূর্ণ জ্ঞানসমৃদ্ধ জীবনে তারা ফিরে আসবে।

কিন্তু সমাজ তার বিশেষ ছাঁচের উপযোগী করে মানুষের মনকে ঢেলে সাজার বন্দোবস্ত করে। এই বন্দোবস্ত এত ঘনসংবদ্ধভাবে করা হয় যে এর মধ্য দিয়ে প্রকৃতিকে আনবার জন্য ফাঁক খুঁজে পাওয়া যায় না। যদি কেউ এই ব্যবস্থা থেকে খানিকটা স্বাধীনতা লাভের, এমন-কি নিজের আত্মাকে রক্ষার চেষ্টা করে, তবে শেষ বিন্দু পর্যন্ত তাকে ধারাবাহিক শাস্তি পেতে হয়। সুতরাং সত্যের উপলব্ধি এক ব্যাপার, আর যখন প্রচলিত ব্যবস্থার স্রোত আপনার বিপক্ষে তখন সত্যকে কর্মে রূপদান আর-এক ব্যাপার। এই কারণে যখন আমি আমার পুত্রকে শিক্ষাদানের সমস্যার সম্মুখীন হলাম, তখন এর কার্যকরী সমাধান খুঁজে পাই নি। প্রথম কাজ আমি যা করেছিলাম, তা হচ্ছে— তাকে শহরের পরিবেশ থেকে সরিয়ে গ্রামে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং আধুনিক কালে যতদূর সম্ভব ততদূর আদিম প্রাথমিক জীবনের স্বাধীনতা তাকে দিয়েছিলাম। সেখানে তার সঙ্গী ছিল ভয়ংকরী নদী। বয়স্কদের আশঙ্কার শাসনমুক্ত হয়ে

সে ঐ নদীতে সাঁতার কাটত ও দাঁড় বাইত। সেখানে আমার পুত্র প্রান্তরে, ক্ষেতে ও পথহীন বালুচরে সময় কাটাত, এবং যখন সে আহারের জন্য অনেক দেরিতে ফিরত তখন তাকে কোনো রকম প্রশ্ন করা হত না। তার অবস্থায় ছেলেরা যে-সব বিলাসিতাকে কেবল প্রথাসম্মত নয়, আবশ্যকীয় বলে মনে করত, সে-সবের কিছুই তার ছিল না। আমি নিশ্চিত জানি যে, তাব জন্য আমার পুত্রকে করুণা করা হত ও যাদের কাছে সমাজ সারা বিশ্বকে আড়াল করে আছে, তারা তার পিতামাতাকে দোষী বলে গণ্য করেছে। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে বিলাসিতা ছেলেদের পক্ষে বোঝা। তারা অন্যান্য লোকের অভ্যাসের উপর বোঝা। তাদের পিতামাতারা তাদের মধ্য দিয়ে যে সুখ ও গর্ব অনুভব করেন, এ হল তারই বোঝা।

তথাপি একজন স্বল্পবিত্ত মানুষ বলে আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী আমার পুত্রের শিক্ষার জন্য আমি বিশেষ কিছু করতে পারি নি। কিন্তু তার চলাফেরার স্বাধীনতা ছিল। প্রকৃতির জগৎ ও তার মাঝে সম্পদ ও সম্মানের সামান্যই আবরণ ছিল। এই বিশ্ব সম্পর্কে সত্য অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ এইভাবে আমার চেয়ে তার বেশি ছিল। কিন্তু সব কিছুর চেয়ে একটি বিষয় আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল।

(শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে সত্যের ঐক্য বোধ দান।) পূর্বে যখন জীবন ছিল সরল, তখন মানুষের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পূর্ণ ঐক্য ছিল। কিন্তু যখন শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উপাদান থেকে চিন্তাশক্তি-উপাদান বিচ্ছিন্ন হল, তখন বিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থা মানুষের শারীরিক জীবন ও চিন্তাশক্তির উপর সমস্ত ঝোঁক দিল। শিশুদের নানা সংবাদ সরবরাহে আমাদের সমস্ত মনোযোগ

অর্পিত হল। আমরা জানলাম না যে এই ঝোঁকের দ্বারা মানুষের চিন্তাজীবন, শারীরিক জীবন ও অধ্যাত্মজীবনের মধ্যে বিচ্ছেদকে আমরা ত্বরান্বিত করে তুলছি।

এই জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো-কিছু বলে নয়, তার অন্তর্গূঢ় সত্যরূপেই আমি এক অধ্যাত্মজীবনে বিশ্বাস করি। নিশ্বাস-গ্রহণের সঙ্গে আমরা নিশ্চয়ই এই সত্যকে অনুভব করব যে আমরা ঈশ্বরের জগতে বাস করি। অনন্তের রহস্যভরা এই বিশাল জগতে জন্মগ্রহণ করে আমরা আমাদের অস্তিত্বকে ক্ষণিক আকস্মিকতার প্রবল অভ্যুত্থান বলে মনে করতে পারি না। এক অন্তহীন শূন্যতার দিকে জড়পদার্থের স্রোতে নিজেদের ভাসমান বলে মনে করতে পারি না। আমাদের জীবনকে সর্বকালে নিদ্রিত এক স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্ন বলে আমরা মনে করতে পারি না। আমাদের একটি ব্যক্তিত্ব আছে। অনন্তরূপে ব্যক্তিগত কোনো কিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত না হলে তার কাছে জড়পদার্থ ও শক্তি অর্থহীন বলে বিবেচিত হবে। এই অনন্তরূপে ব্যক্তিগত যে শক্তি তার প্রকৃতি খানিকটা পরিমাণে মানুষের ভালোবাসায়, সত্যের মহত্ত্বে, বীর আত্মার আত্মোৎসর্গে, প্রকৃতির অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে আমরা আবিষ্কার করেছি। তা কখনোই নিছক প্রাকৃতিক ঘটনা নয়, তা ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

ছোটবেলা থেকে নিরন্তর অগ্রাহ্য করার অভ্যাসের ফলে আমরা এই অধ্যাত্ম জগতের বাস্তবতাকে হারাই। এই অধ্যাত্ম জগতের অভিজ্ঞতাকে শিশুরা অর্জন করতে পারে পূর্ণরূপে এই জগতের মধ্যে বেঁচে থেকে, ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় তাকে পাবে না। কিন্তু কী ভাবে তা করা যাবে, সেটা সমস্যা। বর্তমানকালে তার সমাধান হওয়া কঠিন। কারণ অধুনা মানুষ তার সারা

সময়ে এত কর্মব্যস্ত থাকে যে তাদের কোনো অবকাশ নেই। এই অবকাশহীনতার ফলে তারা জানতে পারে না যে তাদের কাজকর্মে কোনো সত্য নেই এবং তাদের আত্মা তার জগৎকে হারাচ্ছে।

ভারতবর্ষে আমরা অদ্যাবধি মহান্ শিক্ষকদের আরণ্য উপনিবেশের কথা স্মরণ করি। আধুনিক অর্থে এগুলিকে বিদ্যালয় বা মঠ বলা যায় না। এই-সব স্থানে শিক্ষকেরা সপরিবারে বাস করতেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বরের মধ্যে জগৎকে প্রত্যক্ষ করা ও নিজেদের জীবনে তাঁকে উপলব্ধি করা। যদিও তাঁরা সমাজের বাইরে বাস করতেন তথাপি তাঁরা সমাজেরই প্রেরণা ছিলেন। গ্রহমণ্ডলীর কাছে সূর্য যেমন জীবন ও আলোকের উৎস, এই শিক্ষকেরা তেমনি সমাজের প্রেরণা-উৎস ছিলেন। আর এই-সব আশ্রমে গৃহজীবনে প্রবেশের যোগ্যতা লাভের পূর্বে ছাত্রেরা অনন্ত জীবনের অন্তরঙ্গ দৃষ্টির মধ্যে বেড়ে উঠত।

তাই প্রাচীন ভারতে যেখানে জীবন, সেখানেই বিদ্যালয়। সেখানে ছাত্রেরা বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের গভীর পরিবেশে বা মঠের নির্জন পঙ্গু জীবনে বেড়ে উঠত না, প্রাণপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাব পরিবেশে বেড়ে উঠত। ছাত্রেরা গোরু চরাতে নিয়ে যেত, জ্বালানি সংগ্রহ করত, ফলমূল আহরণ করত, সর্ব জীবের প্রতি দয়া দেখাত, এবং তাদের গুরুদের আধ্যাত্মিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজ অধ্যাত্ম-জীবনে বেড়ে উঠত। এটা সম্ভব হয়েছিল এই কারণে যে এই-সব ক্ষেত্রে শিক্ষাদান মূল উদ্দেশ্য ছিল না; যাঁরা ভাগবত জীবন যাপন করতেন তাঁদের আশ্রয় দানই মূল উদ্দেশ্য ছিল।

গুরু ও ছাত্রের চিরাচরিত সম্পর্ক নিছক কল্পনাবিলাস ছিল না। তার প্রমাণ আমরা এখনো দেশী শিক্ষাব্যবস্থার অবশিষ্টাংশে

পাই। এই ব্যবস্থা বহু শতাব্দী ধরে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। কিন্তু আজ বিদেশী আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের চাপে তা ধ্বংস হতে চলেছে। 'ইউনিভার্সিটি'র সংস্কৃত নাম ছিল চতুষ্পাঠী। এই-সব চতুষ্পাঠীতে বিদ্যালয়ের গন্ধ ছিল না। ছাত্রেরা ঘরের ছেলের মতো তাদের গুরুগৃহে বাস করত, সেখানে খাওয়া-পরা ও শিক্ষার জন্য তাদের কিছু দিতে হত না। গুরু সরল জীবন যাপন করতেন, আপন বিদ্যার অনুশীলন করতেন, এবং ছাত্রদের পাঠে সহায়তা করতেন। সে সাহায্য বৃত্তির খাতিরে নয়, তা গুরুর জীবনেরই অঙ্গ ছিল।

গুরুর সঙ্গে এক মহৎ আকাঙ্ক্ষার জীবন শুরু করার এই শিক্ষাদর্শ আমার মনকে অধিকার করেছিল। আমাদের রুদ্ধ ভবিষ্যৎ ও পঙ্গু সুযোগ-সুবিধার নীচতা আমাকে আরো বেশি ক'রে ঐ আদর্শ উপলব্ধির পথে ঠেলে দিয়েছিল। অন্যান্য দেশে যাদের জাগতিক ব্যাপারে সীমাহীন প্রত্যাশা রয়েছে, তারা ঐ-সব ব্যাপারে শিক্ষার উদ্দেশ্যকে নিবদ্ধ করতে পারে। তাদের জীবনের পরিধি এত বিচিত্র ও বিস্তৃত যে তারা তাদের শক্তি বিকাশের আবশ্যকীয় স্বাধীনতা পায়। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে আমরা নিজেদের ও ঈশ্বরের কাছে যে আত্মসম্মানের জন্য ঋণী, তাকে রক্ষা করার জন্য অবশ্যই শিক্ষার উদ্দেশ্যকে মানবজীবনের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্যর চেয়ে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন করব না। সে উদ্দেশ্য হল আত্মার পরিপূর্ণতম বিকাশ ও স্বাধীনতা। অতি সামান্য সম্পদের জন্য কাড়াকাড়ি করা নিন্দার কথা। যে জীবন মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে যায় ও সকল অবস্থার উপরে ওঠে, সে জীবনে আমাদের প্রবেশাধিকার লাভ হোক; আমাদের ঈশ্বরকে আমরা যেন খুঁজে পাই; ধূলির দাসত্ব থেকে যা আমাদের মুক্ত করে, এবং যা

আমাদেরকে বস্তুপুঞ্জের নয়, আন্তর আলোকের সম্পদ, শক্তির নয়, ভালোবাসার সম্পদ দান করে, সেই পরম সত্যকে যেন আমরা খুঁজে পাই। আত্মার এই মুক্তি আমাদের দেশে পুঁথিবিদ্যাহীন ও চরম দরিদ্র মানুষের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। ভারতবর্ষে আমাদের এই অধ্যাত্মজ্ঞানের সম্পদ উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা পেয়েছি। আমাদের সামনে এই জ্ঞানের দ্বার উন্মোচন ও আমাদের জীবনে তার সত্য ব্যবহারের ক্ষমতার উদ্বোধন, এই হোক আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য। আর যখন সময় আসবে তখন যেন জগতের অনন্ত মঙ্গলের জন্য তার কাছে এই জ্ঞানের ভাণ্ডার আমাদের উপহার স্বরূপ অর্পণ করতে পারি—তাই হোক আমাদের সাধনা।

যখন এই সত্য তার গভীরতম বেদনা নিয়ে আমার মনকে আঘাত করল, তখন আমি সাহিত্যকর্মে ডুবে ছিলাম। নিশীথের দুঃস্বপ্নচিন্তায় শ্বাসরুদ্ধ মানুষের মতোই তখন আমি যন্ত্রণা অনুভব করেছি। এ আমার আপন আত্মা নয়, আমার দেশের আত্মাই যেন আমার মধ্য দিয়ে শ্বাসগ্রহণের জন্য সংগ্রাম করছিল। আমি পরিষ্কার অনুভব করলাম যে কোনো বিশেষ জাগতিক পদার্থ—সম্পদ, স্বাচ্ছন্দ্য বা ক্ষমতার প্রয়োজন নেই, আত্মিক স্বাধীনতার পূর্ণ চেতনায় আমাদের জাগরণ প্রয়োজন। সে স্বাধীনতা হল ঈশ্বরাশ্রিত জীবনের স্বাধীনতা—সেখানে যারা লড়াই করে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই, যারা অর্থ উপার্জন করে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা নেই—সেখানে আমরা সকল আক্রমণের বাইরে ও সকল অপমানের ঊর্ধ্বে।

আমার সৌভাগ্যক্রমে আমার এমন একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল যেখানে আমি আমার কাজ শুরু করতে পারি। আমার পিতৃদেব তাঁর অসংখ্য ভ্রমণের একটিতে এই নির্জন ক্ষেত্রটিকে তাঁর ঈশ্বর-

সাধনার যোগ্য ক্ষেত্র বলে নির্বাচন করেছিলেন। যাঁরা ধ্যান ধারণার জন্য শান্তি ও নির্জনতা অন্বেষী, তাঁদের ব্যবহারের জন্যে স্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা এই স্থানটিকে তিনি উৎসর্গ করেছিলেন। যখন আমি এই ক্ষেত্রে আসি ও কোনোরকম পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই আমার নতুন জীবন শুরু করি, তখন আমার সঙ্গে মাত্র দশটি ছাত্র ছিল।

আমাদের আশ্রমের চার দিকে বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তর রয়েছে। এখানে-ওখানে কয়েকটি শীর্ণ খেজুর গাছ ও উইঢিপির উপর কাঁটাঝোপ ছাড়া আদিগন্ত বিস্তৃত এই প্রান্তর শূন্য পড়ে আছে। মাটির খানিকটা নীচু অংশে লাল পাথর ও কাঁকরের অসংখ্য ছোটো ছোটো টিলা রয়েছে, নানা আকৃতির ও রঙের নুড়িপাথর ছড়ানো রয়েছে, আর তার মাঝ দিয়ে বৃষ্টিজলের সরু নালি চলে গেছে। দক্ষিণে অনতিদূরে একটি গ্রাম আছে। সেদিকে তাকালে তালবৃক্ষ শ্রেণীর বিরতির মধ্য দিয়ে মাটির গর্তে জমা নীল জলের উজ্জ্বল উপরিভাগ দেখা যায়। গ্রামবাসীদের শহরে হাটবাজারে যাবার একটি পথ নির্জন প্রান্তরের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে; তার গেরুয়া ধুলোয় আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। এই পথে যে ভ্রমণকারীরা আসেন, তাঁরা আন্দোলিত ভূমিশীর্ষে একটি মন্দিরের চূড়া ও একটি বাড়ির শিরোদেশ দেখতে পান। তা হচ্ছে আমলকীকুঞ্জ ও উন্নত শালবীথির মধ্যে অবস্থিত শান্তিনিকেতন আশ্রম।

আর এখানেই পনের বছর ধরে আমার বিদ্যালয়টি নানা পরিবর্তন ও প্রায়শঃই গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। কবি হিসেবে আমার কুখ্যাতি থাকার ফলে আমাকে অনেক কষ্ট ক'রে আমার দেশবাসীর আস্থা অর্জন ও আমলাতন্ত্রের সংশয় নিরাকরণ করতে হয়েছে। আমি যে শেষ পর্যন্ত তা করতে

পেরেছি, তার জন্যে আমার অপ্রত্যাশা কিছুটা দায়ী। বাইরের সহানুভূতি, সাহায্য বা উপদেশ ছাড়াই আমি আমার পথে চলেছি। আমার সাধ্য ছিল খুবই কম, তার উপর ভারী ঋণের বোঝা কাঁধে চেপেছিল। কিন্তু এই দারিদ্র্যই আমাকে স্বাধীনতার পূর্ণ শক্তি দিয়েছে, আমাকে বস্তুর উপর নির্ভর না ক'রে সত্যের উপর নির্ভর করতে শিখিয়েছে।

এই বিদ্যালয়ের বৃদ্ধি হয়েছে আমার জীবনের বৃদ্ধির সঙ্গে, আর তা নিছক আমার মতবাদের বাহনরূপে নয়। যেমন ভাবে পেকে-ওঠা ফলের আয়তন গড়ে ওঠে, রং গভীর হয়, তার ভিতরকার শাঁস বদ্‌লে যায়, সেই ভাবে এই বিদ্যালয়ের আদর্শ তার পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে বদ্‌লেছে। আমি এই ধারণা নিয়ে শুরু করেছিলাম যে আমাকে একটি পরোপকারী উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে। আমি খুব খেটেছিলাম, কিন্তু এই তৃপ্তিমাত্র পেয়েছিলাম যে অর্থ, উদ্যম ও সময় ব্যয়িত হয়েছে এবং তার জন্যে আমি আমার অভ্রান্ত সততার প্রশংসা করতে পারি। কিন্তু ফল যা পেয়েছিলাম, তার মূল্য সামান্য। আমি একটার পর একটা শিক্ষাব্যবস্থা গড়েছি ও ভেঙেছি। তা কেবল আমাব সময়কে অধিকার ক'রে ছিল, কিন্তু অন্তরে আমার কাজ ছিল শূন্যতায় ভরা। আমার বেশ মনে রয়েছে আমার পিতৃদেবের এক পুরানো শিষ্য এসেছিলেন ও আমাকে বলেছিলেন, আমার চার দিকে যা দেখছি তা যেন বিবাহবাসরের মতো, এখানে আয়োজনের কোনো ত্রুটি নেই, কেবল বরই আসে নি। আমার ভুল হয়েছিল যে আমি আমার উদ্দেশ্যকে সেই বর বলে মনে করেছিলাম। কিন্তু ধীরে ধীরে আমার হৃদয় তার কেন্দ্রভূমিকে খুঁজে পেল। তা কাজের মধ্যে নেই, আমার ইচ্ছার মধ্যে নেই, আছে সত্যের মধ্যে। আমি

শান্তিনিকেতন-ভবনের ছাতে একা বসেছিলাম ও আমার সামনে শালবীথিকার বৃক্ষশীর্ষদেশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলাম। আমার নিজস্ব কর্ম-পরিকল্পনা ও হিসাব থেকে, আমার দৈনন্দিন সংগ্রাম থেকে আমার অন্তরকে সরিয়ে নিয়েছিলাম ও আকাশভরা শান্তি ও প্রসন্নতার সামনে নিঃশব্দে তুলে ধরেছিলাম। ধীরে ধীরে আমার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে গেল। আমার আত্মার দৃষ্টি দিয়ে আমার চারপাশের জগৎকে দেখতে শুরু করলাম। গাছগুলিকে পৃথিবীর মূক হৃদয় থেকে উত্থিত নিঃশব্দ স্রোত বলে আমার মনে হত। আর ছেলেদের হাসি ও চীৎকার সন্ধ্যাকাশের সঙ্গে মিশে আমার কাছে মানবজীবনের গভীরতা থেকে উত্থিত জীবন্ত শব্দের গাছ বলে মনে হত। আমার অন্তরতব মনকে স্পর্শ করেছিল যে সূর্যালোক, তারি মধ্যে আমি আমার বাণীকে পেয়েছিলাম, এবং আকাশের পরিপূর্ণতা উপলব্ধি করেছিলাম। এই পূর্ণতা আমাদের প্রাচীন ঋষিদের মতো আমার কাছে এই মন্ত্র উচ্চারণ করেছিল— 'কোহ্যেবান্যাৎ, কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ'। যদি আকাশ প্রেমে না পূর্ণ হত তবে এই জগতে কে চলতে পারত, লড়াই করত ও বেঁচে থাকতে পারত? এই ভাবে আমি সংগ্রাম থেকে ফলের দিকে ফিরলাম, অপরের মঙ্গল করাব ইচ্ছা থেকে নিবৃত্ত হলাম, ও আমার অন্তর্গূঢ় প্রয়োজনের কাছে ফিরে এলাম। আমি অনুভব করলাম, সত্যের মধ্যে একের জীবনধারণ হচ্ছে সকল জগতের মধ্যে জীবনধারণ। তখন বাইরের সংগ্রামেব অশান্ত পরিবেশ সরে গেল এবং সকল বস্তুর কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টির শক্তি আত্মপ্রকাশ করল। এখন পর্যন্ত আমাদের নানা প্রতিষ্ঠানের কাজে যা অগভীর ও ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়, তার জন্য দায়ী আত্মা সম্বন্ধে আমাদের মনের মধ্যে বিরাজিত

সংশয়, আমাদের আত্ম-গুরুত্ব সম্বন্ধে চেতনা, আমাদের ব্যর্থতার জন্যে বাইরে কারণ সন্ধানের অভ্যাস, এবং আমাদের কর্মশৈথিল্য সংশোধনের জন্যে প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন কঠোরভাবে প্রয়োগের প্রয়াস। আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি যে যেখানে— বিশেষত অধ্যাত্মজীবনের ক্ষেত্রে অপরকে শিক্ষাদানের ব্যগ্রতা খুব প্রবল, সেখানে সামান্যই ফল পাওয়া যায়; আর তা অসত্য-মিশ্রিত। আমাদের ধর্মীয় প্রত্যয় ও ব্যবহারের মধ্যেকার সকল ভণ্ডামি ও আত্মপ্রতারণা এসেছে গুরুগিরির অত্যুৎসাহী কর্মের উত্তেজনা থেকে। আমাদের আধ্যাত্মিক প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দেওয়া বা নেওয়া একই ব্যাপার; যেমন, প্রদীপের ক্ষেত্রে নিজের আলো জ্বালানো ও অপরকে আলোকদান— একই ব্যাপার। যখন কোনো ব্যক্তি অপরের কাছে ঈশ্বরের মহিমা প্রচারকে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করে, তখন সে যা সত্যের নির্দেশ দেবে, তার চেয়ে বেশি ধুলো উড়বে। ধর্মশিক্ষা কখনো পাঠ্যরূপে দেওয়া যায় না। ধর্মশিক্ষা সেখানেই পাওয়া যায় যেখানে ধর্ম জীবন্তরূপে বর্তমান। সুতরাং আজকের দিনেও ঈশ্বর-সন্ধানীদের আরণ্য উপনিবেশ অধ্যাত্ম-জীবনের যথার্থ বিদ্যালয় বলে পরিগণিত হতে পারে। ধর্ম অংশত বিভক্ত বস্তু নয়। তা নির্ধারিত সাপ্তাহিক বা দৈনিক পরিমাপে বিদ্যালয়-পাঠ্যতালিকার নানা বিষয়ের মতো একটু একটু ক'রে দেওয়া যায় না। ধর্ম হল আমাদের সম্পূর্ণ সত্তার সত্য, অনন্তের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক সম্বন্ধে চেতনা। ধর্ম হচ্ছে আমাদের জীবনের মাধ্যাকর্ষণ-কেন্দ্র। যে স্থলে অধ্যাত্ম জগতের সত্য নানা প্রয়োজনের কৃত্রিম গুরুত্বের দ্বারা আবৃত হয় নি, সেই স্থলে বাল্যকাল থেকে নিত্য জীবনধারণের দ্বারা আমরা ধর্মকে লাভ করতে পারি। সেখানে জীবন সরল, অবকাশের পূর্ণতায়

মণ্ডিত। সেখানে প্রচুর বিস্তার, বিশুদ্ধ বায়ু ও প্রকৃতির সুগভীর নিস্তব্ধতায় জীবন পূর্ণ। সেখানে মানুষের সামনে যে অনন্ত জীবন রয়েছে, তার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখেই মানুষ জীবনধারণ করে।

[কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, আমি আমার আদর্শকে এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পেয়েছি কি না। আমার উত্তর হচ্ছে, আমাদের গভীরতম আদর্শের রূপায়ণকে বাইরের পরিমাপ দ্বারা নির্ধারণ করা কঠিন। এই আদর্শের কাজকে তখনি ফলের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। মানবজীবনের নানা অসাম্য ও বৈচিত্র্যকে আমাদের আশ্রমে আমরা পূর্ণভাবে স্বীকার করেছি। মানব-প্রকৃতির নানা স্বাতন্ত্র্যকে উপড়ে ফেলে ও আশ্রমিকদের শিক্ষা দিয়ে একটা বাইরের সমতা লাভের চেষ্টা আমরা কখনো করি নি। আমাদের মধ্যে কিছু লোক ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত, কিছু লোক হিন্দুধর্মের অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত ; এবং আর কিছু লোক খ্রীস্টান। সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাস ও মতবাদ নিয়ে আমরা কারবার করি না ব'লে আমাদের ধর্মবিশ্বাসের এই-সব বিরোধিতা আমাদের কোনো রকম অসুবিধায় ফেলে নি। আমি আরো জানি যে, এই আশ্রমে যাঁরা একত্র হয়েছেন, এই স্থানের আদর্শ ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে তাঁদের শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার মধ্যে বহু পার্থক্য ও বিভেদ রয়েছে। আমি জানি যে এক উচ্চতর জীবনের জন্য আমাদের প্রেরণা জাগতিক বস্তু ও খ্যাতির লোভকে ছাড়িয়ে অনেক উপরে উঠতে পারে নি। তথাপি আমি নিশ্চিত যে আশ্রমের আদর্শ আমাদের স্বভাবের মধ্যে প্রতিদিন গভীর থেকে গভীরে পৌঁচচ্ছে, এবং তার অসংখ্য প্রমাণও রয়েছে।] আমাদের অজ্ঞাতে আমাদের জীবনের তারগুলি বিশুদ্ধতর অধ্যাত্ম সুরে বাঁধা হয়ে যাচ্ছে। এখানে আমার মূলে যে গোড়াকার উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন,

আমাদের সকল অনৈক্যের মধ্য দিয়ে আজ সেখানে বিরামহীন আহ্বান ধ্বনিত হচ্ছে। তা হচ্ছে 'শান্তম্, শিবম্, অদ্বৈতম্'-এর আহ্বান। এখানে আকাশ অনন্তের কণ্ঠধ্বনিতে প্লাবিত হয়েছে, প্রত্যুষের শান্তি ও রাত্রির নৈঃশব্দ্য অর্থপূর্ণ ও গভীর হয়ে উঠছে, এবং শরতে শুভ্র শিউলি ফুল ও গ্রীষ্মে মালতী ফুলের মধ্য দিয়ে তা আত্মোৎসর্গের পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের বাণী প্রেরণ করছে।

আরণ্য আশ্রয় 'আশ্রম' শব্দটিকে ঘিরে যে কত ভাবানুষঙ্গ রয়েছে, তা ভারতীয় ছাড়া আর কারোর পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন। কারণ ভারতবর্ষে এই আশ্রম সূর্যালোকের ও উজ্জ্বল তারকামণ্ডলীর উদার দাক্ষিণ্যভরা আকাশের নীচে শতদলের মতো বিকশিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের আবহাওয়া আমাদের কাছে উন্মুক্ত আকাশের আমন্ত্রণ নিয়ে এসেছে। তার বিশাল নদীগুলি স্রোত-গুঞ্জনে ভাবগম্ভীর। ভারতের সমতলভূমির সীমাহীন বিস্তার আমাদের ঘরকে অন্য এক জগতের নৈঃশব্দ্যে ভরে রাখে। এই ভারতবর্ষে সবুজ পৃথিবীর প্রান্ত থেকে অজ্ঞাতের পাদপীঠের প্রতি অদৃশ্যের অঞ্জলির মতো সূর্য উদিত হন, এবং দিনশেষে অনন্তের প্রতি প্রকৃতির প্রণামের উজ্জ্বল রঙীন অনুষ্ঠানের মতো পশ্চিম দিগন্তে অস্তমিত হন। ভারতবর্ষে তরুচ্ছায়া আতিথ্যে ভরা, ধরণীর ধূলি আমাদের প্রতি তার ধূসর বাহু বাড়িয়ে দিয়েছে, বাতাস আলিঙ্গনের দ্বারা আমাদের আতপমণ্ডিত করে। এই-সব অপরিবর্তনীয় তথ্য আমাদের মনে চিরকাল তাদের ইঙ্গিত প্রেরণ করে। আর সেই কারণে আমরা অনুভব করি যে জগতের আত্মার সঙ্গে মানব-আত্মার মিলনের মধ্য দিয়ে পরম-আত্মায় মানবাত্মার সত্য উপলব্ধি করা ভারতের জীবনের উদ্দেশ্য। প্রাচীন-কালের আরণ্য বিদ্যালয়ে এই জীবনোদ্দেশ্য তার স্বভাব-রূপটি

গ্রহণ করেছিল। আর এই উদ্দেশ্য এখনো সৃষ্টির সকল রূপের মধ্যে, ভালোবাসার মানবিক সম্পর্কের মধ্যে অনন্তের অন্বেষণে আমাদের প্ররোচিত করে। যে বাতাসে আমরা নিঃশ্বাস নিই, যে আলোকে চোখ মেলি, যে জলে স্নান করি, যে পৃথিবীতে আমরা বাঁচি ও মরি, সেখানেই আমরা অনন্তকে উপলব্ধি করার প্রয়াস করি। সুতরাং আমি জানি— আর তা আমি নিজ অভিজ্ঞতায় জানি— যে, এই আশ্রমে ছাত্র ও শিক্ষক -রূপে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা প্রতিদিন অনন্তের চেতনায় মনের মুক্তির পথে চলেছেন। এই মুক্তি কোনো শিক্ষাপদ্ধতি বা বাইরের শাসনের মধ্য দিয়ে আসবে না। তার আগমন ঘটবে আকাঙ্ক্ষার এক অদৃশ্য পরিবেশে। এই পরিবেশ ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ মিলনের মাঝে যে ভক্ত আত্মা বাস করেছে, তার ক্ষেত্র ও স্মৃতিকে ঘিরে আছে।

আমি আশা করি, যে সচেতন উদ্দেশ্য -প্রণোদিত হয়ে আমি আশ্রমে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলাম, তা কী ভাবে ক্রমশ তার স্বাতন্ত্র্য হারালো ও এই স্থানের উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিশে গেল, তা আমি ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছি। এক কথায় আমার কাজ আশ্রমের জীবনীশক্তির মধ্যে তার আত্মাকে খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু সন্দেহ নেই এই আত্মার বাহ্যিক রূপ আছে— তা হল বিদ্যালয়ের দিক। আর এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে আমি এত বছর ধরে আমার শিক্ষাতত্ত্ব চালাবার চেষ্টা করেছি। এই তত্ত্বের ভিত্তি শিশুমন সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা।

আমি পূর্বে যে কথা ইঙ্গিত করেছি, সে-অনুযায়ী আমি বিশ্বাস করি শিশুদের সচেতন বুদ্ধি অপেক্ষা তাদের অর্ধচেতন মন বেশি পরিমাণে সক্রিয়। আমাদের পাঠ্যবিষয়ের একটা বড়ো গুরুত্বপূর্ণ অংশই আমরা এর মাধ্যমে শিখেছি। সংখ্যাহীন প্রজন্মের অভিজ্ঞতা

তার বাহন মারফত আমাদের প্রকৃতিতে প্রবেশ করেছে। তার ফলে আমরা কেবল শ্রান্ত হই না, তা আমাদের আনন্দও দেয়। আমাদের জীবনের সঙ্গে এই অর্ধচেতন জ্ঞানবৃত্তি মিশে আছে। এই জ্ঞানবৃত্তি বাইরে থেকে জ্বালা যায় ও পলতে ছেঁটে দেওয়া যায় এমন লণ্ঠনের মতো নয়; বরং তা আপন জীবন-প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত জোনাকির আলোর মতো।

সৌভাগ্যক্রমে আমি এমন এক পরিবারে জন্মেছিলাম যেখানে সাহিত্য, সংগীত ও শিল্পকলা সহজাত প্রবৃত্তি হয়ে উঠেছিল। আমার ভাই ও আত্মীয়েরা নানা আদর্শের স্বাধীনতায় বাস করত, এবং তাদের বেশির ভাগেরই স্বাভাবিক শিল্পক্ষমতা ছিল। এই পরিবেশে লালিত হবার ফলে আমি খুব গোড়া থেকেই চিন্তা করতে, স্বপ্ন দেখতে ও আমার চিন্তাকে প্রকাশ করতে শুরু করলাম। ধর্মাচরণ ও সামাজিক আদর্শের ক্ষেত্রে আমাদের পরিবার সকল প্রথা থেকে মুক্ত ছিল। আর গোঁড়া বিশ্বাস ও প্রথা থেকে আমাদের বিচ্ছেদের ফলে সমাজ আমাদের একঘরে করেছিল। এই সমাজচ্যুতি মনের স্বাধীনতাক্ষেত্রে আমাদের নির্ভয় করে তুলেছিল, এবং জীবনের সব ক্ষেত্রেই আমরা নানা পরীক্ষা চালিয়েছিলাম। আমার বাল্যজীবনে মানসিক ও শিল্পগত বৃত্তিচর্চার স্বাধীনতা ও আনন্দ আমি ভোগ করেছিলাম। আর তার ফলে আমার মন তার বিকাশলাভের স্বাভাবিক পরিবেশ সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠেছিল। তাই বিদ্যালয়প্রথার উৎপীড়ন আমার পক্ষে এত অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

যখন আমি আমার বিদ্যালয় স্থাপন করি, তখন কেবল আমার বাল্যজীবনের এই অভিজ্ঞতা সহায় ছিল। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, শিক্ষাদানের কোনো মামুলি পদ্ধতি নয়, সংস্কৃতিময়

পরিবেশই সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন। আমার সৌভাগ্যক্রমে বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ একটি তরুণ ছাত্র সতীশচন্দ্র রায়কে পেলাম। তিনি তখন বি. এ. পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। তিনি আমার বিদ্যালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হলেন ও আমার আদর্শকে রূপদানের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করলেন। তাঁর বয়স তখন সবেমাত্র উনিশ, কিন্তু তাঁর একটি আশ্চর্য আত্মা ছিল। তিনি আদর্শের জগতে বাস করতেন। প্রকৃতিরাজ্যে ও মানবপ্রকৃতিতে যা-কিছু সুন্দর ও মহৎ, তাতে তিনি গভীরভাবে সাড়া দিতেন। যদি তিনি বেঁচে থাকতেন তবে তিনি কবিরূপে বিশ্বসাহিত্যের অমর শিল্পীদের মধ্যে আসন গ্রহণ করতেন। কিন্তু যখন তাঁর বয়স বিশ বছর, তখন তিনি মারা গেলেন, এবং এইভাবে সামান্য এক বছরের জন্য তিনি আমাদের বিদ্যালয়ের সেবা করে গেছেন। সতীশচন্দ্রের কাছে ছাত্রেরা কখনো অনুভব করে নি যে তারা অধ্যয়নের সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে আছে। ছাত্রেরা যেন সর্বত্র প্রবেশাধিকার পেয়েছিল। যখন বসন্তকালে শালতরু পূর্ণমুঞ্জরিত হয়ে উঠত তখন ছাত্রেরা তাঁর সঙ্গে শালবীথিতে যেত, আব তিনি উত্তেজনায় পরিপূর্ণ হয়ে তাদের কাছে তাঁর প্রিয় কবিতাগুলি আবৃত্তি করতেন। তিনি ছাত্রদের শেকস্‌পীয়র এমনকি ব্রাউনিঙ্ পড়াতেন, কারণ তিনি ব্রাউনিঙের বড়ো অনুরাগী ছিলেন। আর তাঁর আশ্চর্য প্রকাশক্ষমতার জোরে ছাত্রদেব কাছে তিনি শেকস্‌পীয়র-ব্রাউনিঙের কাব্য বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যা করতেন। ছেলেদের বোঝবার ক্ষমতাকে তিনি কখনো অবিশ্বাস করেন নি। তিনি নিজে যে বিষয়ে কৌতূহলী, সে বিষয়েই তিনি ছেলেদের কাছে বলতেন ও পড়তেন। সতীশচন্দ্র জানতেন যে ছেলেদের পক্ষে আক্ষরিকভাবে যথাযথরূপে বোঝবার কোনো

প্রয়োজনই নেই, কিন্তু তাদের মনকে জাগ্রত করতে হবে। এই ক্ষেত্রে তিনি সাফল্যলাভ করেছিলেন। তিনি অন্যান্য শিক্ষকদের মতো নিছক পাঠ্যপুস্তকের বাহনমাত্র ছিলেন না। তিনি শিক্ষাদানকে ব্যক্তিগত কর্ম বলে গ্রহণ করেছিলেন, তিনি নিজেই তার উৎস ছিলেন, ও সেই কারণে তাকে জীবনের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন ; আর তা জীবনশক্তিপূর্ণ মানবপ্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সতীশচন্দ্রের সাফল্যের আসল কারণ হল জীবনে, আদর্শে ও তাঁর চারপাশের সব-কিছুতে তাঁর গভীর ঔৎসুক্য, এবং তাঁর সংস্পর্শে যে ছেলেরা আসত তাদের সম্পর্কে গভীর কৌতূহল। বইয়ের মাধ্যমে নয়, জগতের সঙ্গে তাঁর সংবেদনশীল মনের প্রত্যক্ষ সংযোগের মাধ্যমে তিনি প্রেরণা লাভ করতেন। লতাপাতার উপরে ঋতু-প্রভাব যেমন ছিল, তাঁর উপরে তেমনি ঋতু-প্রভাব ছিল। মহাশূন্যে সদা ভ্রাম্যমাণ, বাতাসে ভাসমান, আকাশে দীপ্তিমান, ও পৃথিবীতে ঘাসে ঘাসে কম্পমান অদৃশ্য প্রকৃতিবাণীকে সতীশচন্দ্র তাঁর রক্তের মধ্যে অনুভব করতেন। তিনি যে সাহিত্য পাঠ করতেন, তাতে গ্রন্থাগারের সামান্যতম গন্ধ ছিল না। যেমনভাবে তাঁর বন্ধুদের দেখতেন, সেইভাবে তাঁর আদর্শগুলিকে রূপস্বাতন্ত্র্য ও জীবনের সূক্ষ্মদর্শিতা সমেত চোখের সামনে দেখবার ক্ষমতা সতীশচন্দ্রের ছিল।

আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রদের এই সৌভাগ্য হয়েছিল যে তারা পাঠ্যপুস্তক থেকে নয়, এক প্রাণবান শিক্ষকের কাছ থেকে তাদের পাঠ গ্রহণ করেছিল। অনেক আবশ্যকীয় জিনিসের মতোই কি বইগুলি জগৎ ও আমাদের বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে নেই? আমাদের মনের বাতায়নকে বইয়ের পাতা দিয়ে ঢেকে দেবার অভ্যাস আমাদের গ্রাস করেছে, আর আমাদের মানসিক চামড়ার উপর

কেতাবী বাক্যের পলেস্তারা এঁটে বসেছে, তার ফলে তা সকল প্রত্যক্ষ সংযোগের বাইরে চলে গেছে। কেতাবী সত্যের পুরো জগৎ এক কঠিন দুর্গ গড়ে তুলেছে, আমরা তারই প্রাচীরের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছি ও ঈশ্বরের সৃষ্টি থেকে নিজেদের নিরাপদ করে তুলেছি। অবশ্য, গ্রন্থচর্চার সুবিধাকে যথার্থ মূল্য না দেওয়াটা আমাদের পক্ষে বোকামি। কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা অবশ্যই স্বীকার করব যে গ্রন্থচর্চার নানা বিধিনিষেধ ও বিপদ আছে। শিক্ষার গোড়াকার পর্যায়ে যেভাবেই হোক স্বাভাবিক পথে শিশুদের সত্যের শিক্ষালাভ করা উচিত— সে শিক্ষা সোজাসুজি নানা ব্যক্তি ও বস্তুর মধ্য দিয়ে আসবে।

এই ব্যাপারে নিঃসংশয় হয়ে আশ্রমে ভাবের পরিবেশ রচনায় আমি আমার সমস্ত সম্পদকে কাজে লাগিয়েছি। বিশেষ করে শিশুমনের জন্যই আমি গান রচনা করি নি। কবি তাঁর আপন খুশিতে গান রচনা করেছেন। বস্তুতঃপক্ষে গীতাঞ্জলির বেশির ভাগ এখানেই রচিত হয়েছিল। এই-সব গান টাটকা অবস্থায় ছেলেদের কাছে গাওয়া হয়েছিল, এবং তারা দল বেঁধে এই-সব গান শিখতে আসত। অবসরসময়ে, পূর্ণিমারাত্রে খোলা আকাশের তলায়, শ্রাবণে আসন্ন-বর্ষণ মেঘের ছায়ায় বসে ছেলেরা দল বেঁধে গান গাইত। আমার পরবর্তীকালের সকল নাটক এখানেই রচিত হয়েছে, আর ছেলেবা তাদের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছে। তাদের ঋতু-উৎসবের জন্য গীতিনাট্য রচিত হয়েছে। গদ্যে বা ছন্দে লেখা কোনো নতুন রচনা, তা যে বিষয়েই হোক-না কেন, আমি যখন শিক্ষকদের কাছে পড়ে শোনাতাম, তখন ছেলেরা সেখানে বিনাবাধায় হাজির হত। ছেলেরা বিনা চাপেই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করত, আর তাতে আমন্ত্রিত না হলে বেদনা

বোধ করত। ভারতবর্ষ ছেড়ে আসার কয়েক সপ্তাহ আগে আমি তাদের কাছে ব্রাউনিঙের নাটক 'লুরিআ' পড়ে শুনিয়েছি, ও পড়তে পড়তে তা বাংলায় অনুবাদ ক'রে গেছি। এই পাঠে দুটি সন্ধ্যা লেগেছিল, কিন্তু দ্বিতীয় সন্ধ্যাও প্রথম সন্ধ্যার মতো ছাত্রে পূর্ণ ছিল। যাঁরা এই ছেলেদের নাট্যাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতে দেখেছেন, তাঁরা অভিনেতারূপে এদের আশ্চর্য ক্ষমতা লক্ষ্য ক'রে বিস্মিত হয়েছেন। তার কারণ এই অভিনয়শিল্পে ছেলেরা কখনোই কোনো প্রত্যক্ষ শিক্ষা পায় নি। যে-সব নাটকে ছেলেরা অভিনয় করেছিল, তার মূল বক্তব্যে তারা সহজাত প্রবৃত্তিবশে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু এই নাটকগুলি নিছক ছাত্রদের উপযোগী ছিল না। এই-সব নাটক উপলব্ধির জন্য সূক্ষ্ম বোধশক্তি ও সহানুভূতি প্রয়োজন। আপন নাটকের অভিনয় সম্পর্কে নাট্যকারের উদ্বেগ ও অতিসমালোচনাপ্রবণ অনুভূতি নিয়ে ছেলেদের অভিনয় দেখে আমি কখনো হতাশ হই নি। ছেলেরা যেভাবে চরিত্রগুলিকে রূপ দিত, সে ব্যাপারে আমি কখনোই শিক্ষকদের হস্তক্ষেপ করতে দিই নি। ছেলেরা প্রায়ই নিজেরা নাটক রচনা করে বা হঠাৎ না ভেবে লিখে ফেলে। তাদের অভিনয় দেখতে আমরা আমন্ত্রিত হয়েছি। ছেলেরা তাদের সাহিত্যসভার অনুষ্ঠান করে। তাদের কম ক'রে তিনটে হাতেলেখা সচিত্র পত্রিকা আছে, বিদ্যালয়ের তিন বিভাগের ছেলেরা ওগুলি চালায়। তার মধ্যে সব চেয়ে কৌতূহলপূর্ণ পত্রিকা হচ্ছে শিশুবিভাগের পত্রিকা। আমাদের কিছু ছেলে অঙ্কন ও চিত্রণের আশ্চর্য ক্ষমতা দেখিয়েছে। এই ক্ষমতা মডেল কপি করার গোঁড়া পদ্ধতিতে বিকাশ লাভ করে নি। তাদের নিজস্ব প্রবণতা অনুসরণে এবং মাঝে মাঝে চিত্রশিল্পীদের আগমনে ও নিজস্ব চিত্রকর্ম প্রদর্শনের ফলে ছেলেদের ক্ষমতা

বিকশিত হয়েছে।

যখন আমি আমার বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন করি, তখন ছেলেদের সংগীতপ্রীতির কোনো পরিচয় পাই নি। তার ফল এই যে, আমি গোড়ায় পাঠক্রমগ্রহণে ছেলেদের বাধ্য করি নি। আমাদের মধ্যে যাদের ক্ষমতা আছে তারা যেন তাদের সংগীত-প্রতিভার চর্চা করতে পারে, আমি কেবল তার সুযোগ ক'রে দিয়েছি। এর ফলে ছেলেদের কান অচেতনভাবে গীতশিক্ষার উপযোগী হয়ে উঠেছে। ক্রমশ যখন তাদের অনেকেই সংগীতের প্রতি প্রবল ঝোঁক ও প্রীতি দেখিয়েছে তখন আমার মনে হয়েছে যে তারা এখন সংগীতের দস্তুরমাফিক পাঠগ্রহণে প্রস্তুত, আর তখন আমি একজন সংগীতশিক্ষক নিযুক্ত করেছি।

আমাদের বিদ্যালয়ে ছেলেরা খুব সকালে, কখনো বা আলো দেখা দেবার আগেই ওঠে। তারা তাদের স্নানের জল আনে, বিছানা তোলে। আত্মসাহায্যের বৃত্তিচর্চার উপযোগী সব-কিছুই তারা করে।

আমি ধ্যানের প্রহরে বিশ্বাস করি, এবং সকালে ও সন্ধ্যায় ঐ উদ্দেশ্যের জন্যে পনের মিনিট আলাদা করে রেখেছি। আমি ধ্যানের সময়টির উপর জোর দিই। অবশ্য আমি ছেলেদের ভণ্ড হতে বলি না ও ধ্যানাসীন হবার ছলনা করতে বলি না। কিন্তু আমি জোর দিই এখানে যে তারা শান্ত থাকবে, আত্মসংযমের ক্ষমতাকে প্রয়োগ করবে, এমন-কি ঈশ্বরের চিন্তা না করেও গাছের উপরে কাঠবেড়ালীদের ছুটোছুটি নিবিষ্ট মনে লক্ষ্য করবে।

এই ধরণের বিদ্যালয়ের বর্ণনা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। কারণ এখানে সব-চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পরিবেশ, আর আসল ব্যাপার এই যে, এটি স্বেচ্ছাচারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা ছেলেদের-উপর-চাপানো

বিদ্যালয় নয়। আমি সর্বদাই ছেলেদের বোঝাতে চেয়েছি যে এই বিদ্যালয় তাদের নিজস্ব জগৎ, এখানে তাদের জীবন সম্পূর্ণভাবে ও স্বাধীনভাবে বিকশিত হবে। বিদ্যালয়ের পরিচালনায় ছেলেদের স্থান আছে, আর শাস্তিদানের ব্যাপারে আমরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব বিচারালয়ের উপর নির্ভর করি।

উপসংহারে আমি আমার শ্রোতাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, তাঁরা যেন আশ্রম সম্পর্কে কোনো মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত ধারণা পোষণ না করেন। যখন কাগজে কলমে আদর্শ বর্ণিত হয়, তখন সেগুলি খুব সরল ও সম্পূর্ণ বলে মনে হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে নানা জীবন্ত, বিচিত্র ও নিত্যপরিবর্তমান পদার্থের মধ্য দিয়ে তাদের যে প্রকাশ ঘটে, তা স্বচ্ছ ও নিখুঁত নয়। মানবস্বভাবের মধ্যে ও বাইরের পরিবেশে অনেক বাধা আছে। অপরপক্ষে, ছেলেদের গ্রহণশীলতার নানা স্তর আছে ও তাদের মধ্যে একটা বড়ো অংশের অনিবার্য ব্যর্থতা আছে। কাজের মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে নানা ত্রুটি দেখা দেয়, তার ফলে আমরা আমাদের নিজ আদর্শের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে সন্দিহান হই। আমরা সংশয় ও প্রতিক্রিয়ার নানা অন্ধ পর্বের মধ্য দিয়ে যাই। কিন্তু এই-সব সংঘর্ষ ও বিচ্যুতি বাস্তবতার সত্য দিক। জীবন্ত আদর্শ কখনো ঘড়ির কাঁটার মতো একপথে চলতে পারে না। প্রতি মুহূর্তে সঠিক বিবরণ দিতে পারে না। যাঁরা আদর্শে দৃঢ়নিষ্ঠ থাকেন, তাঁদের নানা বেসুর ও ব্যর্থতার মধ্যে আদর্শের সত্য পরীক্ষা করতে হয়। এই-সব বেসুর ও ব্যর্থতা তাঁদের পথচ্যুত করার জন্য নানা প্রলোভন দেখাবেই। আমার ক্ষেত্রে আমি জীবনের নীতিতে বিশ্বাস করি, প্রক্রিয়া অপেক্ষা মানুষের আত্মাকে বেশি বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মনের মুক্তিসাধন। তা কেবল মুক্তির পথেই পাওয়া

যায়— জীবনের মতো এই মুক্তিরও নানা ঝুঁকি ও দায়িত্ব রয়েছে। যদিও অধিকাংশ লোক ভুলে গেছে বলে মনে হয়, তথাপি আমি নিশ্চিত জানি যে শিশুরা প্রাণবান মানুষ। আপনার চার দিকে অভ্যাসের খোলস তৈরি করেছে যেমন বয়স্ক মানুষ, তাদের চেয়ে শিশুরা অনেক বেশি প্রাণবান। সুতরাং শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য ও বিকাশের জন্য নিছক পাঠ তৈরির বিদ্যালয় থাকলে চলবে না, ব্যক্তিগত ভালোবাসায় পরিচালিত এক জগৎ থাকা একান্তই প্রয়োজন। এই জগৎ হচ্ছে আশ্রম। সেখানে মানুষ প্রকৃতির শান্তিতে জীবনের সর্বোচ্চ পরিণতি লাভের জন্য একত্র হয়েছে। সেখানে জীবন নিছক ধ্যানের ব্যাপার নয়, বরং নানা কাজে পূর্ণ জাগ্রত। সেখানে জাতির আত্মরূপের অর্চনাই ছেলেদের পক্ষে গ্রহণীয় সত্যতম আদর্শ— এই শিক্ষায় নিরন্তর ছেলেদের মনকে দীক্ষিত করা হয় না। সেখানে ছেলেরা মানুষের জগৎকে ঈশ্বরের রাজ্য বলে উপলব্ধি করতে ও সে রাজ্যের নাগরিক অধিকার লাভের জন্য নিজেদের তৈরি করতে শিক্ষালাভ করে। সেখানে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও তারকামণ্ডলীর নিঃশব্দ গৌরবকে প্রত্যহ অগ্রাহ্য করা হয় না। সেখানে প্রকৃতিতে ফুল ও ফলের উৎসব-সমারোহে মানুষের আনন্দময় স্বীকৃতি লাভ করে। আর সেখানে নবীন ও প্রবীণ, শিক্ষক ও ছাত্র, একই স্থানে বসে তাদের দৈনন্দিন আহার্য-দ্রব্য ও তাদের অনন্ত জীবনের খাদ্য গ্রহণ করে।

এমন অনেক বস্তু আছে যা আমরা বাইরে থেকে পাই ও সম্পদ বলে আমাদের কাছে রেখে দিই। কিন্তু ধ্যানের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ঠিক উল্টো। তা হল কোনো মহৎ সত্যের মধ্যে আমাদের এমনভাবে প্রবেশ ঘটে যে পরিণতিতে তা আমাদের অধিকার করে।

এখন বিপরীত তুলনায় দেখা যাক, সম্পদ কী। অর্থ শ্রমের প্রতিনিধি। অর্থের দ্বারা আমি মানুষ থেকে শ্রমকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিতে পারি ও তাকে আমার নিজস্ব সম্পদ করে তুলতে পারি। আমি তা বাইরের থেকে পাই ও তাকে আমার আপন ক্ষমতায় রূপান্তরিত করি।

তা ছাড়া আছে জ্ঞান। এক ধরণের জ্ঞান আছে যা আমরা অপর ব্যক্তি থেকে পাই। আর-এক ধরণের জ্ঞান আছে যা আমরা পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও যুক্তির প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্জন করি।

যা আমার থেকে দূরে আছে তাকে আমার নিজস্ব বলে আয়ত্ত করার জন্যই এই সমস্ত প্রয়াস। এই-সব বস্তুতে আমাদের মানসিক ও শারীরিক শক্তি এমনভাবে প্রযুক্ত হয়, যা ধ্যানের ঠিক বিপরীত।

(সর্বোচ্চ সত্যকে কেবল তার মধ্যে ডুবে গিয়ে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। আর যখন আমাদের চেতনা তার মধ্যে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়, তখন আমরা জানতে পারি তা নিছক অধিকার নয়, পরন্তু আমরা এই সত্যের সঙ্গে এক হয়ে গেছি।

এইভাবে ধ্যানের মধ্য দিয়ে আমাদের আত্মা যখন মহান্ সত্যের যথার্থ সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আমাদের সকল কর্ম,

কথা, ব্যবহার সত্য হয়ে ওঠে।

ধ্যানের একটি মন্ত্র যা আমরা ভারতবর্ষে ব্যবহার করি, তা আপনাদের কাছে আমি উপস্থিত করছি।

ওঁ ভূভুর্বঃ স্বঃ
তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহী
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

ওঁ॥ তার অর্থ সম্পূর্ণতা। এই শব্দটি যথার্থই অনন্ত, সম্পূর্ণ, চিরন্তনের অর্থবাহী প্রতীক শব্দ। এই শব্দের ধ্বনি সম্পূর্ণ ধ্বনি, তা সকল বস্তুর সমগ্রতাকে বোঝায়।

আমাদের সকল ধ্যান ওঁ-তে শুরু হয় এবং ওঁ-তে শেষ হয়। এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়, যার ফলে মন অনন্ত সম্পূর্ণতার ব্যঞ্জনায় পূর্ণ হয় এবং সংকীর্ণ স্বার্থের জগৎ থেকে মুক্ত হয়।)

ভূভুর্বঃ স্বঃ॥

ভূঃ শব্দের অর্থ এই পৃথিবী।

ভুবঃ শব্দের অর্থ মধ্যদেশ— আকাশ।

স্বঃ শব্দের অর্থ তারকাশোভিত গগনক্ষেত্র।

পৃথিবী, আকাশ, তারকাশোভিত গগন। আপনাকে এই বিশ্বের হৃদয়দেশে আপনার মনকে স্থাপন করতে হবে। আপনাকে উপলব্ধি করতে হবে যে, আপনি অনন্তে জন্মগ্রহণ করেছেন, আপনি এই পৃথিবীর কোনো বিশেষ স্থানের অন্তর্ভুক্ত নন, আপনি সমগ্র জগতের অন্তর্ভুক্ত।

তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহী॥

[বিশ্বের সৃষ্টিকর্তার পূজনীয় শক্তির আমি ধ্যান করি। সৃষ্টিকর্তা শব্দটির নিরন্তর ব্যবহারে তার অর্থ মলিন হয়েছে। কিন্তু আপনাকে আপনার চেতনদৃষ্টিতে সব-কিছুর বিশালতা অনুভব

করতে হবে, এবং তারপর বলতে হবে, ঈশ্বর তাঁর অনন্ত সৃজনী-শক্তির বলে নিরন্তর প্রতি মুহূর্তে এই জগতকে সৃষ্টি করছেন, তা একটি বিচ্ছিন্ন ক্রিয়ার ফল নয়।

সব-কিছুই সৃষ্টিকর্তার অনন্ত ইচ্ছার প্রতিনিধি। তা মাধ্যাকর্ষণের সূত্রের মতো নয়; আমি যাকে অর্চনা করতে পারি না অথবা যা আমার পূজা দাবি করতে পারে না, এমন বিমূর্ত বস্তুমাত্র নয়। কিন্তু এই মন্ত্র বলেছেন যে এই শক্তি পূজনীয়, তা এক মহান্ পুরুষের শক্তিবলে আমাদের পূজা দাবি করে। তাই এই শক্তি নিছক বিমূর্ততা নয়।

এই শক্তির প্রকাশ কী?

এই শক্তি এক দিকে পৃথিবী, আকাশ ও নক্ষত্রশোভিত গগন; অপর দিকে তা আমাদের চেতনা।

[আমার সঙ্গে জগতের চিরন্তন সম্পর্ক রয়েছে, কারণ আমার চেতনায় এই জগতের অপর দিকটি রয়েছে। যদি তার উৎস ও কেন্দ্রে কোনো মহান্ চেতনা ও চেতনসত্তা না থাকত, তবে জগতের সৃষ্টি হত না।

ঈশ্বরের শক্তি আমার চেতনায় ও বাহির বিশ্বে নিঃসৃত ও প্রবাহিত হয়। সাধারণতঃ আমরা নিজেরাই একে বিভক্ত করি। কিন্তু সত্যি বলতে কি সৃষ্টির এই দুটি দিক অন্তরঙ্গ সম্পর্কে আবদ্ধ, কারণ তারা একই উৎস থেকে যাত্রা শুরু করেছে।

এইভাবেই এই ধ্যানের অর্থ হচ্ছে, আমার চেতনা ও আমার বাইরে বিশাল জগৎ এক। এই ঐক্য কোথায়?

ঐক্য রয়েছে মহা শক্তিতে। 'তিনি আমার মধ্যে ও আমার বাইরেকার জগতে চেতনাকে প্রবাহিত করেন।]

এই ধ্যানের অর্থ আমাতে কিছু গ্রহণ করা নয়, আমাকে

বর্জন করা ও সকল সৃষ্টির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।]

এই আমাদের মন্ত্র। আমরা এতেই আমাদের মনকে নিবিষ্ট করি। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের মন নিবিষ্ট হয় ও বাইরের আকর্ষণ দূরীভূত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বারবার এই মন্ত্র উচ্চারণ করি। তার ফলে কোনো ক্ষতি, কোনো ভয়, কোনো যন্ত্রণা আমাদের স্পর্শ করতে পারে না, মানুষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সরল ও স্বাভাবিক হয়, আমরা মুক্ত হই। এই হল ধ্যান— এই সত্যে নিমজ্জিত হওয়া, এর মধ্যে জীবনধারণ ও চলাফেরা করা, এবং এর মধ্যে আমাদের সত্তাকে লাভ করাই আমাদের ধ্যান।)

আমাদের বিদ্যালয়ের ছেলেদের ধ্যান ও দৈনন্দিন প্রার্থনায় ব্যবহৃত হয়, এমন আর-একটি মন্ত্র আপনাদের কাছে বলি।

ওঁ পিতা নোঽসি, পিতা নো বোধি। নমস্তেঽস্তু ॥

পিতা নোঽসি।

তুমিই আমাদের পিতা।

পিতা নো বোধি।

আমাদের বোধ দাও, চেতনা দাও— তুমিই আমাদের পিতা— এই সত্যে আমাদের জাগ্রত করো।

নমস্তেঽস্তু।

'নমঃ' শব্দের কোনো প্রতিশব্দ ইংরেজীতে নেই। তবে 'স্যালুটেশন্' শব্দের দ্বারা প্রায় কাছাকাছি একটি অর্থ পাওয়া যায়।

তোমার কাছে আমার 'নমঃ'— তা সত্য হোক।

মন্ত্রের এই প্রথমাংশটি আমাদের ছেলেরা ব্যবহার করে।

এই মন্ত্রের দ্বারা আমি যা বুঝেছি, তা ব্যাখ্যা করা যাক।

পিতা নোঽসি। মন্ত্রের সূচনা হচ্ছে এই দাবিতে যে—ঈশ্বরই আমাদের পিতা।

কিন্তু এই সত্য এখনো পর্যন্ত আমাদের জীবনে উপলব্ধ হয় নি, আর সেই কারণেই আমাদের এত অপূর্ণতা, দুঃখযন্ত্রণা ও পাপ রয়েছে। সুতরাং আমরা প্রার্থনা করি, আমরা যেন আমাদের চেতনায় এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারি, এবং তাই আমরা প্রার্থনা করি আমরা যেন তা করতে সমর্থ হই।

তারপর 'নমস্তে' বলে মন্ত্রটি শেষ হচ্ছে। আমার 'নমঃ' যেন সত্য হয়। কারণ এই 'নমঃ' হচ্ছে সত্য দৃষ্টিভঙ্গী। যখন আমি 'পিতা নোঽসি' এই সত্যকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি, তখনি আমার জীবন তার আপন সত্যকে তার 'নমঃ', তাব মিনতি, তার আত্মসমর্পণের দ্বারা দেবার্চনার বিনীত অনুভূতিতে ব্যক্ত করে।

আমাদের প্রার্থনায় আমরা অনেক তৃপ্তিদায়ী শব্দ ব্যবহার করি। কোনো কোনো সময় আমরা কেবল যান্ত্রিকভাবেই তা উচ্চারণ করি এবং তার পূর্ণতার উপলব্ধিতে আমাদের সমস্ত মনকে প্রয়োগ করি না। 'পিতা' এই ধরণের একটি শব্দ।

সুতরাং আমাদের ধ্যানে মন্ত্রকে আরো গভীরভাবে বুঝতে হবে ও হৃদয়ের মধ্যে তার সত্যের সঙ্গে উপলব্ধি করতে হবে।

এই জগৎ যে রূপে আমাদের সামনে আইনের মাধ্যমে দেখা দেয়, সে রূপে আমরা জগৎকে গ্রহণ করতে পারি। আমাদের মনের মধ্যে জগৎ সম্পর্কে এই ধারণা গড়ে তুলতে পারি যে এই জগৎ হল শক্তি ও পদার্থের জগৎ। তারপরে এর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিছক যান্ত্রিক সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আমবা মানুষের মধ্যে যে সর্বোচ্চ সত্য আছে, তাকে হারাই। কারণ মানুষ কী? মানুষ হচ্ছে ব্যক্তিগত সত্তা। আইন সে পরিচয়কে গ্রাহ্য করে না।

আমাদের শারীরিক জ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও আমাদের সত্তার

যান্ত্রিকতা নিয়েই আইনের কারবার। যখন আমরা আমাদের ব্যক্তিগত স্বভাবের ক্ষেত্রে আসি, তখন কোনো আইনের দ্বারা তাকে ব্যাখ্যা করা যায় বলে আমাদের জানা নেই। সুতরাং আমাদের সম্পর্কে সত্যের মূল ভিত্তিকেই বিজ্ঞান অগ্রাহ্য করে। তার ফলে সমগ্র জগৎ একটা যন্ত্রে পরিণত হয়, এবং তখন সৃষ্টিকর্তাকে পিতারূপে দেখার কোনো প্রশ্নই ওঠে না; আমরা ভারতীয়েরা যে তাঁকে 'জননী' বলে ডাকি, সেভাবে ডাকারও কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

যদি আমরা এই জগৎকে নিছক শক্তির যোগফল রূপে দেখি, তবে তার পূজা করার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু আমরা নিছক শারীরিক বস্তু বা মনোবিশ্লেষণের বস্তু নই। আমরা নর ও নারী। আর আমরা যে মানুষ, সমগ্র বিশ্বে তার অনন্ত অর্থটি আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে।

আমার শরীর যে রয়েছে, বিজ্ঞান তা বিশ্বগত নিয়মের দ্বারা ব্যাখ্যা করে। তার ফলে আমি আমার শরীরকে সৃষ্টির এক বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে করি না, বরং একটি বিশাল সমগ্রের অংশরূপে দেখি। তখন আমি দেখি, এমন-কি আমার মন, বিশ্বে যা ঘটছে তার সঙ্গে ঐক্য রেখে চিন্তা করছে। আর তখন আমি আমার মনের সাহায্যে বিশ্বনিয়ন্ত্রণকারী মহান্ নিয়মগুলিকে খুঁজে পাই।

কিন্তু বিজ্ঞান আমাকে সেখানেই থেমে যেতে বলে। কারণ বিজ্ঞানের কাছে শরীর ও মনের নিয়মগুলি বিশ্বের পটভূমিতে ধরা পড়ে, কিন্তু ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি নেই। কিন্তু আমরা অনুভব করি যে আমরা এই মতকে গ্রহণ করতে পারি না। কারণ যদি সব-কিছুর মতোই সত্যের সঙ্গে এই ব্যক্তিত্বের চিরন্তন সম্পর্ক না থাকে, তবে তা কোন্ অলীক কল্পনা? এই জগতে ব্যক্তিত্ব কেন এবং কী

ভাবে বর্তমান ? আমি-ব্যক্তির তথ্য অবশ্যই অনন্ত-ব্যক্তির সত্যের দ্বারা সমর্থিত হবে। আমাদের মধ্যে 'আমি' এই সত্যের প্রত্যক্ষ দর্শন থেকে আমরা এই মহৎ সত্যে উপনীত হয়েছি যে অবশ্যই এক অনন্ত 'আমি' আছেন।

তখন প্রশ্ন ওঠে— 'এই মহান ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক ?' অন্তরের অন্তবে মানুষ এই প্রশ্নের উত্তর পেয়েছে, এই সম্পর্ক হচ্ছে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক— ভালোবাসার সম্পর্ক।

এই উত্তরের অন্যথা হতে পারে না, কারণ সম্পর্ক তখনই পূর্ণতা লাভ করে যখন তা ভালোবাসার সম্পর্ক হয়।

রাজা ও প্রজার সম্পর্ক, প্রভু ও ভৃত্যের সম্পর্ক, আইনকারী ও আইন-পালনকারীর সম্পর্ক— এ-সবই হল বিশেষ ব্যবহারের জন্য আংশিক সম্পর্ক। সমগ্র সত্তা এখানে জড়িত নয়। কিন্তু অনন্ত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এই ব্যক্তি 'আমি'-র পূর্ণতম সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। তার অন্যথা হতে পারে না। আমরা ভালোবেসেছি ও ভালোবাসার মধ্যে আমাদের ব্যক্তিত্বেব অনন্ত তৃপ্তি লাভ কবেছি ব'লে আমরা জানতে পেরেছি যে অনন্ত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হল ভালোবাসাব সম্পর্ক। আর এইভাবেই মানুষ বলতে শিখেছে— আমাদের পিতা ; রাজা নয়, প্রভু নয়, পিতা।

বক্তব্য এই, তাঁর মধ্যে এমন কিছু আছে আমরা যার অংশ-ভাগী ; তা হল এই অনন্ত ব্যক্তি ও এই সান্ত ক্ষুদ্র ব্যক্তির মধ্যে ঐক্যবিধায়ী সম্পর্ক।

[তথাপি প্রশ্ন থেকে যায়— মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রকাশ যে শব্দ 'পিতা', তা আমি কেন ব্যবহার কবব ? আমরা অন্য-একটি শব্দ আবিষ্কার করতে পারি না কেন ? এই শব্দটি কি খুব সান্ত ও ক্ষুদ্র নয় ?

আমাদের সংস্কৃত ভাষায় 'পিতা' শব্দটি জননীকে তার অন্তর্ভুক্ত করেছে। প্রায়ই আমরা দ্বিবচনে শব্দটিকে ব্যবহার করি— 'পিতরৌ'— তার অর্থ পিতা ও মাতা। মানুষ মায়ের কোলে জন্মায়। মেঘ থেকে যেমনভাবে বৃষ্টি আসে সেভাবে আমরা আসি নি। বড়ো তথ্য এই, আমার মাতা ও পিতার কোলে আমি এই জীবনে এসেছি। তার থেকে দেখা যায় যে ব্যক্তিত্বের ধারণা আগে থেকেই এখানে রয়েছে। এখানেই অনন্ত ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আমরা খুঁজে পাই। আমরা জানি যে আমরা ভালোবাসা থেকে জন্মেছি— আমাদের সম্পর্ক ভালোবাসার সম্পর্ক। আমরা অনুভব করি যে আমাদের পিতা ও মাতা ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের চিরন্তন সম্পার্কের প্রতীক। প্রতি মুহূর্তে আমাকে এই সত্য উপলব্ধি করতে হয়। আমাকে জানতে হয় যে আমার 'পিতা'র সঙ্গে আমার চিরন্তন সম্পর্ক রয়েছে। তখন আমি বস্তুর তুচ্ছতার উপরে উঠি এবং সমগ্র জগৎ আমার কাছে অর্থসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

সুতরাং প্রথম প্রার্থনা হচ্ছে ঈশ্বরকে পিতারূপে উপলব্ধি। অসংখ্য নক্ষত্র ও জগতের অনন্ত বিশ্বকে তুমি সৃষ্টি করেছ। তুমি আমাকে উত্তীর্ণ হয়ে যাও, কিন্তু একটি কথা আমি অন্তরঙ্গভাবে জানি— তুমি আমার পিতা।

শিশু তার মায়ের কাজকর্মের সব-কিছু জানে না। কিন্তু শিশু জানে যে তিনি তার জননী।

সেইভাবে ঈশ্বর সম্পর্কে অন্যান্য বিষয় আমি জানি না। কিন্তু আমি এ কথা জানি— তুমি আমার পিতা।

আমার সমস্ত চেতনা এই ধারণায় আগুনের মতো জ্বলে উঠুক, — তুমি আমার পিতা। প্রতিদিন আমার সকল চিন্তার একমাত্র

কেন্দ্র হোক— সমগ্র বিশ্বের নিয়ন্তা যে মহান্ ব্যক্তি, তিনি আমার পিতা।]

'পিতা নো বোধি'। আমি যেন এই মহান্ সত্যের আলোয় জেগে উঠি— তুমি আমার পিতা।

উলঙ্গ শিশুর মতো আমার সকল চিন্তা তোমার কোলে তোমার যত্ন ও আশ্রয়ে সারা দিনের জন্যে আমাকে রাখতে দাও।

আর তার পরে 'নমঃ'।

আমার পূর্ণ আত্মসমর্পণ সত্য হয়ে উঠবে। এই হল মানুষের ভালোবাসার সর্বোচ্চ আনন্দ।

'নমস্তে'। তোমাকে 'নমঃ'। তা যেন সত্য হয়।

অনন্ত 'আমি আছি'-র সঙ্গে আমি সম্পর্কিত, আর তাই আমার সত্য মনোভাব, গর্ব বা আত্মতুষ্টির মনোভাব নয়, তা হল আত্মসমর্পণের মনোভাব। 'নমস্তেঽস্তু'।

আমার ছেলেরা তাদের প্রার্থনা ও ধ্যানে যে মন্ত্রটি ব্যবহার করে, তা আমি এখনো শেষ করি নি।

আপনারা নিশ্চয়ই স্মরণ করবেন যে এই প্রার্থনা আমাদের প্রাচীনতম শাস্ত্র বেদের নানা অংশ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। একটি জায়গায় একটি ক্রমপরম্পরায় তাদের পাওয়া যাবে না। ঈশ্বর-আরাধনায় সমর্পিত-জীবন আমার পিতৃদেব অফুরন্ত জ্ঞানের অমর ভাণ্ডার বেদ ও উপনিষদ থেকে এই মন্ত্রগুলি সংগ্রহ করেছিলেন।

পরের চরণটি হচ্ছে—

('মা মা হিংসীঃ'। আমাকে মৃর্ত্যুর দ্বারা আঘাত কোরো না।

এই কথার অর্থ কি তা আমাদের সম্পূর্ণরূপে বুঝতে হবে। আপনারা আমাকে বলতে শুনেছেন যে, প্রথম চরণে বলা হয়েছে,

তুমি আমার পিতা। এই সত্য সর্বত্র বর্তমান। ‘পিতা’র মহান্ ভাবের মধ্যে আমাদের জন্মাতে হয়। তা মানুষের উদ্দেশ্য ও পরিণতি, সেখানেই তার জীবনের পরিপূর্ণতা।

যদিও এ কথা সত্য যে আমরা আমাদের ‘পিতা’র সঙ্গে চিরন্তন সম্পর্কে আবদ্ধ, তথাপি এই সত্যের পূর্ণ উপলব্ধির পথে কিছু বাধা আছে, এবং সেই বাধাই মানুষের দুঃখের বৃহত্তম উৎস। পশুদের বেদনা আছে, তারা শত্রুর আক্রমণে ও শারীরিক অপূর্ণতায় যন্ত্রণা ভোগ করে। আর এই দুঃখযন্ত্রণা তাদের প্রাকৃতিক জীবনের অভাব মোচনে ও এই-সব বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রামে এগিয়ে যেতে তাড়না করে। এই সংগ্রামের মধ্যেই আনন্দ রয়েছে।) আমরা নিশ্চিত ভাবতে পারি যে তারা সত্যি তাদের জীবনকে উপভোগ করে, কারণ এই ঝোঁকের ফলে পশুরা বাধার বিরুদ্ধে লড়াই করে, এবং তা তাদের সমগ্র জীবনশক্তিকে জাগিয়ে তোলে। অন্যথায় পশুরা গাছপালার জগতের মতোই ব্যবহার করত। (জীবনের পূর্ণতার জন্যই বাধা থাকা আবশ্যক।) আর জড়বস্তুর বাধার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের দ্বারাই জীবন তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করে। পশুর কাছে এই-সব বাধা বেদনানুভূতির সঙ্গেই দেখা দেয়।

(কিন্তু মানুষের কাছে আর-এক গভীরতব দুঃখের উৎস আছে। আমাদেরও জীবিকা অন্বেষণ করতে হয় এবং প্রকৃতি ও মানুষের শত্রুতাকে রোধ করতে হয়। কিন্তু তাই সব নয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পশুদের মতো একই জগতে জন্মগ্রহণ করে ও একই জীবন-প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে, মানুষকে আরও অন্য-কিছুর জন্য লড়াই করতে হয়, যদিও স্পষ্টরূপে তাকে উপলব্ধি করা যায় নি। এই অন্য-কিছু আমাদের কাছে আভাসে দেখা দেয়।

যখন আমরা সম্পদের মধ্যে বাস করি, প্রাচুর্য বিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্যে নিমগ্ন হই, সকল জাগতিক বস্তুর দ্বারা বেষ্টিত হই, তখনো মানুষ অনুভব করে এই-সব বস্তু যথেষ্ট নয়। আর তখনি বায়ু ও অগ্নির মতো কোনো প্রাকৃতিক শক্তির কাছে নয়, যাকে মানুষ পরিপূর্ণভাবে জানে নি বা উপলব্ধি করে নি, সেই সত্তার প্রতি প্রার্থনা ধ্বনিত হয়ে ওঠে। এই প্রার্থনা বলে : আমাকে রক্ষা করো— 'মা মা হিংসীঃ'।)

(আমরা এখানে শারীরিক মৃত্যুর কথা বলছি না, কারণ আমরা জানি আমাদের মরতেই হবে। সুতরাং আমাদের 'পিতা'র কাছে প্রার্থনা শারীরিক অমরতার জন্যে নয়। মানুষ সহজাত প্রবৃত্তি -বশে নিজের মধ্যে অনুভব করেছে যে এই জীবন চূড়ান্ত নয়— তাকে উচ্চতর জীবনের জন্যে সাধনা করতে হবে। আর সেখানেই ঈশ্বরের কাছে মানুষের কাতর প্রার্থনা— আমাকে এই মৃত্যুর রাজ্যে ফেলে রেখো না। তা আমার আত্মাকে তৃপ্ত করে না। আমি খাই দাই, ঘুমোই, কিন্তু আমি সন্তুষ্ট নই। আমি এর মধ্যে আমার কল্যাণ দেখি না— আমি উপবাস করি। মা তার আপন জীবন থেকেই শিশুকে যে দুধ দেয় তার জন্য শিশু যেমন কাঁদে, সেই রকম আমরাও চিরন্তন জননীর কাছে কেঁদে বলি— 'আমাকে মৃত্যুর দ্বারা আঘাত কোরো না', 'মা মা হিংসীঃ'— আমাকে তোমার আপন প্রকৃতি থেকে উৎসারিত জীবন দাও। এই হল ক্রন্দন— আমি ক্ষুধায় কাতর হয়েছি। আমার আত্মা তার পরিবেশের মধ্যে কোনো আহারদ্রব্য পাচ্ছে না বলে তা মৃত্যুর দ্বারা আহত হচ্ছে।)

'বিশ্বানি দেব সবিতুর্দুরিতানি পরাসুব।'

হে ঈশ্বর, আমার পিতা, আমার থেকে পাপের জগৎকে দূর করো। যখন ব্যক্তিস্বার্থের জীবন তার নিজের জন্য সব-কিছু

পেতে চায়, তখন তা আঘাতের পর আঘাত পায়। কারণ তা অস্বাভাবিক, কারণ তার সত্য জীবন মুক্তির জীবন, কারণ তা বন্দী-খাঁচায় তার ডানা ঝাপটায়। আত্মার কাছে এই বন্দীশালা অর্থহীন। আত্মা তার বন্দীশালায় কাতর ক্রন্দন করে— আমি আমার পরিপূর্ণতাকে পাচ্ছি না। আত্মা বন্দীশালার রুদ্ধদ্বারে নিজেকে আঘাত করে। আর এই আঘাত ও বেদনায় আমাদের আত্মা পূর্ণ সচেতন হয়ে ওঠে যে সত্য স্বার্থবদ্ধ জীবনের সত্য নয়, তা আত্মার বৃহত্তর জীবনের সত্য। এই জ্ঞান থেকেই আমাদের দুঃখ আসে, আর আমরা বলে উঠি: 'এই বন্দীশালা ভেঙে ফেলো। আমি এই স্বার্থবদ্ধ জীবনকে চাই না। সকল পাপ, স্বার্থাকাঙ্ক্ষা, স্বার্থের গোপন অভিলাষ বিনষ্ট করো, আর আমাকে তোমার সন্তানরূপে গ্রহণ করো— এই মৃত্যুর জগতের সন্তানরূপে নয়, আপন সন্তানরূপেই গ্রহণ করো।'

আমার 'পিতা'র মধ্যে জীবনের পূর্ণ চেতনা যখন আমরা উপলব্ধি করতে চাই, তখন এই প্রার্থনা আমরা উচ্চারণ করি। সব চেয়ে বড়ো বাধা স্বার্থবদ্ধ জীবন। সুতরাং ঈশ্বরের কাছে মানুষের প্রার্থনা জাগতিক বস্তুর জন্যে নয়; 'পিতা'র সঙ্গে পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্যই প্রার্থনা।

'যদ্‌ভদ্রম্ তন্ন আসুব।' যা কল্যাণকর তা-ই আমাদের দাও। আমরা প্রায়ই এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করি এবং আমাদের পিতাকে যা কল্যণকর তা-ই আমাদের দিতে বলি। কিন্তু আমরা জানি না যে যদি এই প্রার্থনার সম্পূর্ণ উত্তর আমাদের গ্রহণ করতে হয়, তবে তা কী ভয়ংকর প্রার্থনা হয়ে ওঠে। আমাদের মধ্যে খুব কম ব্যাক্তিই আছেন সর্বোচ্চ কল্যাণকে উপলব্ধি ক'রে যাঁরা তা চাইতে পারেন। কেবল তিনিই তা করতে পারেন— যিনি তাঁর

জীবনকে বিশুদ্ধ করতে পেরেছেন, সকল অকল্যাণের শৃঙ্খলামুক্ত করতে পেরেছেন, যিনি নির্ভয়ে ঈশ্বরকে তার কর্ম সম্পূর্ণ করার জন্য বলতে পারেন, 'আমি আমার মনকে নির্মল করেছি, স্বার্থ-আকাঙ্ক্ষার ঝোঁক ও স্বার্থবদ্ধ সংকীর্ণ জীবনের ভয় ও দুঃখ কাটিয়ে উঠেছি, এখন আমি পূর্ণতম আশায় দাবি করতে পারি—যা কল্যাণকর তা আমাকে দাও, তা যে-কোনো রূপেই হোক না কেন— দুঃখে, ক্ষতিতে, অপমানে, শোকে— আমাকে দাও—আমি আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করব, কারণ আমি জানি তা তোমার থেকেই আসছে।'

কিন্তু আমরা যতই দুর্বল হই না কেন, আমাদের এই প্রার্থনা উচ্চারণ করতেই হবে। কারণ আমরা জানি যে যদিও আমরা কষ্ট ও দুঃখে নিমজ্জিত হই, তথাপি যে ব্যক্তি উপলব্ধি করেছে যে সে তার পিতার আশ্রয়ে বাস করে, সে ব্যক্তি তাঁর হাত থেকে যা-ই আসুক না কেন তা সানন্দে গ্রহণ করবে। তা-ই হল মুক্তি। কারণ মুক্তি নিছক সুখের মধ্যে নেই। কিন্তু যখন আমরা বিপদ ও মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করি, দুঃখ ও ক্লেশকে অস্বীকার করি, এবং আমাদের পিতার আশ্রয় সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংশয় পোষণ করি না, তখন আমরা মুক্তি অনুভব করি। তখন সব-কিছুই আমাদের কাছে আনন্দের বাণী বহন ক'রে আসে এবং আমরা তাকে নম্রতা ও আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারি এবং কৃতজ্ঞতায় আমাদের মাথা নত করি।

'নমঃ সম্ভবায়'।

যাঁর থেকে জীবনের আনন্দ প্রবাহিত হয়, তাঁর কাছে নত হই। আমরা সানন্দে নানা পথে প্রবাহিত আনন্দের স্রোতো-ধারাকে অভ্যর্থনা করি, এবং সে-কারণে তোমার কাছে নত হই।

'ময়োভবায় চ'।

যাঁর থেকে মানুষের কল্যাণ প্রবাহিত হয়, আমি তাঁর কাছে নত হই। জীবনের আনন্দ ও বেদনা, লাভ ও ক্ষতি— উভয়ের মধ্যে কল্যাণ নিহিত। যিনি বেদনা, দুঃখ ও শোক দান করেন, তাঁর কাছে আমি নত হই।

'নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ'।

যিনি কল্যাণময়, যিনি সর্বোচ্চ কল্যাণময়, আমি তাঁর কাছে নত হই। এই হচ্ছে সম্পূর্ণ মন্ত্র। মন্ত্রের প্রথম অংশে আমরা নিছক এই পৃথিবী, আকাশ ও জলের জগতে বাস করি না, ব্যক্তিত্ব ও প্রেমের সত্য জগতে বাস করি— এই চেতনা লাভের জন্য প্রার্থনা করি। আর যখন আমরা উপলব্ধি করি যে আমরা এই প্রেমের মধ্যে আছি, তখন প্রেম থেকে বিচ্ছিন্ন আমাদের জীবনে অনৈক্য অনুভব করি। আমাদের পিতার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা সচেতন না হওয়া পর্যন্ত তা অনুভব করি না। কিন্তু যখন আমরা সচেতন হই তখন এই অনৈক্য আমরা এত তীব্রভাবে অনুভব করি যে তা আমাদের আঘাত করে এবং তাকে মৃত্যু ব'লে অনুভব করি। যখন আমরা অতি অল্প মাত্রায় সচেতন হই যে আমরা আমাদের পিতার ভালোবাসায় বেষ্টিত হয়ে আছি, তখনি তা আমাদের অসহ্য হয়ে ওঠে।

তখন বস্তুর শাসন থেকে মুক্তির জন্য ও সর্বোচ্চ কল্যাণের জন্য প্রার্থনা ধ্বনিত হয়, সে প্রার্থনা ঈশ্বরের মুক্তিলাভের প্রার্থনা।

আর তখনি আসে উপসংহার। যাঁর মধ্যে আমরা সকলে জীবনকে উপভোগ করি, যাঁর মধ্যে আত্মার কল্যাণ, যাঁর মধ্যেই মঙ্গল, আমরা তাঁর কাছে প্রণত হই।

ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ, ওঁ।

যখন পুরুষ-প্রাণীরা একে অপরকে হননে লিপ্ত হয়, তখন প্রকৃতি তা দেখেও দেখে না। কারণ তুলনাত্মক বিচারে নারী প্রকৃতির উদ্দেশ্যের সহায়ক, আর পুরুষ নিতান্ত প্রয়োজনের উপাদান। সাবধানী স্বভাবের জন্যে স্ত্রী-প্রাণী যে-সব ক্ষুধার্ত শাবক কলহ করে, প্রচুর খায় অথচ প্রকৃতির দাবি সামান্যই মেটায়, তাদের বিশেষ যত্ন করে না। সুতরাং কীটপতঙ্গের জগতে আমরা লক্ষ্য করি যে, পুরুষ-পতঙ্গের সংখ্যাকে নিতান্ত প্রয়োজনের সীমার মধ্যে বেঁধে রাখার দায়িত্ব স্ত্রী-পতঙ্গ গ্রহণ করেছে।

প্রকৃতির প্রতি আপন দায়িত্ব থেকে পুরুষ অনেকটা পরিমাণে মুক্ত। তার ফলে মানব-জগতে পুরুষদের আপন বৃত্তি ও কর্মোদ্যোগের স্বাধীনতা আছে। মানুষের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এই যে, মানুষ একটি হাতিয়ার-প্রস্তুতকারী পশু। এই কাজটা প্রকৃতির এক্তিয়ারের বাইরে। বস্তুতঃ, আমাদের এই হাতিয়ার তৈরি করার ক্ষমতার জোরে আমরা প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করতে সমর্থ হয়েছি। পুরুষমানুষের কর্মক্ষমতা বেশির ভাগ মুক্ত হবার ফলে, সে এই ক্ষমতাকে বাড়িয়েছে ও বেশ শক্তিমান হয়ে উঠেছে। তাই নারী মানবসমাজের প্রাণ-সৃষ্টি বিভাগে তার প্রকৃতিদত্ত সিংহাসন অদ্যাবধি অধিকার করে আছে। কিন্তু পুরুষ মানসিক বিভাগে আপন রাজ্য সৃষ্টি করেছে ও তাকে বাড়িয়েছে। এই মহৎ কর্মে মনের নিরাসক্তি ও চলাফেরার স্বাধীনতা আবশ্যক।

শারীরিক ও মানসিক আবেগের বন্ধন থেকে পুরুষ অপেক্ষাকৃত মুক্ত। পুরুষ এই মুক্তির সুবিধাটা গ্রহণ করেছে ও জীবনের সীমান্ত বিস্তারের কাজে বাধামুক্ত হয়ে দৃঢ় পদে এগিয়ে গেছে।

এই কাজে পুরুষমানুষ বিদ্রোহ ও ধ্বংসেব বিপজ্জনক পথে যাত্রা করেছে। বাববার তার সঞ্চয় ধুয়ে মুছে গেছে এবং অগ্রগতির স্রোত উৎসবিন্দুতে অন্তর্হিত হয়েছে। যদিও মানুষ অনেক লাভ কবেছে তথাপি তুলনায় অপচয় অনেক বেশি—বিশেষতঃ যখন আমবা ভেবে দেখি যে, সম্পদেব অনেকটা যখন নষ্ট হয়েছে তখন সেই সঙ্গে অগ্রগতিব অনেক প্রমাণও নিয়ে গেছে। বাববাব এই ধ্বংসলীলাব মধ্য দিয়ে মানুষ একটি সত্য আবিষ্কাব কবেছে-- যদিও তা সম্পূর্ণ ব্যবহাব কবতে পাবে নি। তা হচ্ছে, মানুষেব সকল সৃষ্টিকে ধ্বংস থেকে বক্ষাব জন্য তাদেব নৈতিক ছন্দ বজায় বাখতে হবে; ক্ষমতার নিছক বাধাহীন বৃদ্ধি যথার্থ প্রগতিব পথে মানুষকে নিয়ে যায় না, এবং সত্যেব যথার্থ বিকাশেব জন্য অংশগুলিব মধ্যে সমতা, এবং ভিত্তিব সঙ্গে কাঠামোব সঙ্গতি থাকা প্রয়োজন।

স্থায়িত্বেব এই আদর্শ নাবীপ্রকৃতিব একান্ত আকাঙ্ক্ষিত। কেবল চলাব জন্য চলায় কখনো নাবীব আগ্রহ দেখা যায় না, অন্ধকাবেব বুকে কেবল কৌতূহলেব তীব ছোড়ায় তাব কোনো আগ্রহ নেই। নাবীব সমস্ত শক্তি বস্তুকে কোনো একটা পূর্ণ রূপ দেবাব জন্য প্রবৃত্তিবশে কাজ কবে, কাবণ তা হল জীবনেব নিয়ম। জীবনেব গতিতে কিছুই চূড়ান্ত নয়, তথাপি প্রতিটি ধাপেব পূর্ণতাব ছন্দ আছে। এমন-কি কুঁড়িবও বৃত্তাকাব পূর্ণতাব আদর্শ আছে; ফুলেব আছে, ফলেবও আছে। কিন্তু একটা অসম্পূর্ণ বাড়িব নিজস্ব সমগ্রতাব আদর্শ নেই। সুতবাং বাড়িটি অনির্দিষ্ট-ভাবে তাব আয়তনবৃদ্ধিব পথে এগিয়ে চলে। বাড়িটি ধীরে ধীবে তাব স্থায়িত্বের নিরিখকে ছাড়িয়ে যায়। বুদ্ধিভিত্তিক সভ্যতাব পরুষ সৃষ্টিগুলি যেন ব্যাবেলের স্তম্ভ। তারা তাদের ভিত্তিকে

অস্বীকারেব দুঃসাহস দেখায়। সুতবাং বাববাব তারা ভেঙে পড়ে। এই ভাবে ধ্বংসস্তূপেব স্তবেব উপবে মানব-ইতিহাস গড়ে উঠছে। তা জীবনবৃদ্ধিব অবিচ্ছিন্ন ধাবা নয়। মানুষেব বুদ্ধি-জাত অর্থ-নৈতিক ও বাজনৈতিক সংগঠনগুলি কেবল যান্ত্রিক শক্তিব প্রতিনিধিত্ব কবে। তাবা সহজেই জীবনেব প্রতিষ্ঠাজগতে তাদেব আকর্ষণকেন্দ্র ভুলে যায়। ক্ষমতা ও সম্পদেব ক্রমসঞ্চীয়মান লোভেব কোনো নিজস্ব চবম পূর্ণতা নেই; নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পূর্ণতাব আদর্শেব সঙ্গে তাব কোনো সঙ্গতি নেই, তা শেষ পর্যন্ত তাব আপন সম্পদেব ভাবেব উপব প্রচণ্ড আঘাত কবে।

ইতিহাসেব বর্তমান অবস্থায় সভ্যতাব প্রায় সবটাই পৌরুষ; তা হচ্ছে শক্তিব উপব প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা। এখানে নাবীকে এক-ধাবে ছায়ায় সবিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই কাবণে এই সভ্যতা তাব সমতা হাবিয়েছে। এবং তা লাফিয়ে লাফিয়ে এক যুদ্ধ থেকে অপব যুদ্ধে এগিয়ে চলেছে। এই সভ্যতাব চালক-শক্তি হল ধ্বংসেব শক্তি। এক আতঙ্কজনক সংখ্যায় মানুষ-উৎসর্গেব মধ্য দিয়ে তাব নানা আচাব-অনুষ্ঠান পালিত হয়। এই একপেশে সভ্যতা তাব একপেশেমিব জন্য বহু ধ্বংসেব মধ্য দিয়ে দুর্দান্ত গতিতে ছুটে চলেছে। এখন শেষ পর্যন্ত এমন সময় এসেছে যখন অবশ্যই এই বঙ্গমঞ্চে নাবী দেখা দেবে ও ক্ষমতাব অসাবধানী গতিতে তাব জীবনেব ছন্দ যুক্ত কববে।

কাবণ নাবীব কাজ মাটিব নিশ্চেষ্টতাব কাজ। তা কেবল গাছকে বেড়ে উঠতে সাহায্য কবে না, সেই সঙ্গে তাব বৃদ্ধিকে সীমাবদ্ধ কবে রাখে। গাছ নিশ্চয়ই জীবনেব অভিযানে যোগ দেবে, সব দিকে তাব শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দেবে, কিন্তু তাব সম্পর্কের গভীরতর বাঁধনগুলি মাটির নীচে লুকানো ও দৃঢ়বদ্ধ

আছে। তা গাছকে জীবনধারণে সাহায্য করে। আমাদের সভ্যতারও নিশ্চেষ্ট উপাদান নিশ্চয়ই আছে— তা প্রশস্ত, গভীর ও স্থায়ী। তা কেবল নিছক বৃদ্ধি নয়, বৃদ্ধির ঐক্য। তার সবটাই কেবল সুর নয়, তার সময়ও নিশ্চয়ই আছে। এই সময় বাধা নয়, তা হল নদীর পাড়। এই পাড় স্রোতোধারাকে স্থায়িত্বের পথে নিয়ন্ত্রিত করে। অন্যথায় তা নিরাকারের জলায় নিজেকে হারিয়ে ফেলত। তা হল ছন্দ। এই ছন্দ জগতের গতিকে রুদ্ধ করে না, বরং তাকে সত্য ও সৌন্দর্যের পথে চালনা করে।

সতীত্ব, কোমলতা, একনিষ্ঠতা, আত্মোৎসর্গের ক্ষমতা প্রভৃতি নিশ্চেষ্ট গুণে নারী পুরুষ অপেক্ষা বেশি পরিমাণে সমৃদ্ধ। প্রকৃতিতে এই ধীর নিশ্চেষ্ট গুণ হিংস্র শক্তিকে নিখুঁত সৌন্দর্য-সৃষ্টিতে পরিণত করে— বন্য উপাদানগুলিকে পোষ মানিয়ে জীবনের সেবার উপযোগী সূক্ষ্ম কোমলতায় পরিণত করে। এই নিশ্চেষ্ট গুণ নারীকে দিয়েছে বিশাল গভীর প্রশান্তি। জীবনের লালন-পালন সঞ্চয়-নিরাময়ে এই প্রশান্তি খুবই প্রয়োজনীয়। যদি জীবনে সবটাই খরচ হত, তবে তা রকেটের মতো ঊর্ধ্বাকাশে বিদ্যুতের গতিতে ছুটে যেত ও পরমুহূর্তেই ছাই হয়ে যেত। জীবন হওয়া উচিত একটি প্রদীপের মতো। অগ্নিশিখায় আলোকের যে শক্তি দেখা যায়, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ শক্তি প্রদীপের আছে। নারী-প্রকৃতির নিশ্চেষ্টতার গভীরে জীবনের এই শক্তি সঞ্চিত আছে।

আমি অন্যত্র বলেছি, পশ্চিমী জগতের নারীদের মধ্যে একটা অধীরতা লক্ষ্য করা যায়। তা তার প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিচয় নয়। কারণ যে-সব নারী তাদের ঔৎসুক্য জাগিয়ে রাখতে চারপাশে বিশেষ উত্তেজক কিছু চায়, তার থেকে কেবল প্রমাণ

হয় যে, এই-সব নারী তাদের সত্য জগৎ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে পশ্চিমী জগতে বহু নারী ও পুরুষ যা নিতান্তই সাধারণ বস্তু, তার নিন্দা করে। তারা সর্বদাই অসাধারণ কিছুর পিছনে ছুটেছে, এবং একটা কৃত্রিম মৌলিকতা তৈরি করতে সব শক্তি নিয়োগ করছে; কিন্তু তা কেবল বিস্ময় সৃষ্টি করে, মানুষকে তৃপ্তি দেয় না। এই-সব প্রয়াস জীবনীশক্তির যথার্থ ইঙ্গিত নয়। আর সেগুলি পুরুষ অপেক্ষা নারীর পক্ষে বেশি ক্ষতি-কারক। কারণ পুরুষ অপেক্ষা নারীর মধ্যে জীবনীশক্তি প্রবলতর রূপে বর্তমান। নারী মানবজাতির জননী। তাদের চার দিকে যে-সব বস্তু রয়েছে, জীবনের যে-সব সাধারণ বস্তু আছে, সে-সব সম্পর্কে নারীদের সত্যিকারের আগ্রহ বর্তমান। যদি নারীদের এই আগ্রহ না থাকত, তা হলে মানবজাতি ধ্বংস হয়ে যেত।

যদি নিরন্তর বাহ্যিক উত্তেজনার ফলে নারী কোনো মানসিক ওষুধ ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে যায় ও অবিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়-উত্তেজনায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তবে নারী তার স্বাভাবিক উচ্চ অনুভূতি-প্রবণতা হারিয়ে ফেলে, এবং সেই সঙ্গে নারীত্বের প্রস্ফুটিত সৌন্দর্য ও মানবজাতিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা থেকে চ্যুত হয়।

সঙ্গীদের সম্পর্কে কোনো পুরুষের ঔৎসুক্য তখনি সত্য হয়ে ওঠে যখন সে তাদের মধ্যে কোনো বিশেষ ক্ষমতা ও প্রয়োজনীয়তা খুঁজে পায়। কিন্তু কোনো নারী তার সঙ্গিনীদের সম্বন্ধে আগ্রহী হয় এই কারণে যে তারা জীবন্ত প্রাণী, তারা মানবিক গুণসম্পন্ন। তারা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করে বা তাদের এমন কোনো ক্ষমতা আছে যা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য,— সে কারণে কোনো নারী তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। নারীর এই বিশেষ ক্ষমতা

আছে বলে সে আমাদের মনের উপর মুগ্ধ প্রভাব বিস্তার করে তার জীবনাগ্রহের প্রাচুর্য এতই আকর্ষক যে তা নারীর কথা, হাসি, চলাফেরা—সব-কিছুকে লাবণ্যমণ্ডিত করে। আমাদের চারপাশের নানা কৌতূহলের সঙ্গে এই লাবণ্যের সঙ্গতি রয়েছে।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দৈনন্দিন জগৎ সাদামাঠা, সূক্ষ্ম ও ধৃষ্টতাহীন সৌন্দর্যে ভরা। সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্য আমাদের নিজস্ব অনুভূতিশীল মনের উপর নির্ভর করতে হয়। তা অদৃশ্য, কারণ তা আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য। যদি আমরা বাইরের খোলসের মধ্য দিয়ে উঁকি দিতে পারি, তবে আমরা দেখতে পাব যে এই সাদামাঠা জগৎ এক অলৌকিক সৌন্দর্যের জগৎ।

আমাদের ভালোবাসার শক্তির দ্বারা প্রবৃত্তিবশে আমরা এই সত্যকে উপলব্ধি করি। আর নাবী এই শক্তির দ্বারা আবিষ্কার করে যে, তাদের ভালোবাসা ও সহানুভূতির পাত্র তুচ্ছতার রুক্ষ ছদ্মবেশ সত্ত্বেও অনন্ত মূল্যে ভূষিত। যখন সাধারণ বস্তুতে নারীর ঔৎসুক্য বিনষ্ট হয়, তখন অবসর তার শূন্যতার দ্বারা নারীকে ভীত ক'রে তোলে। কাবণ তাদেব স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়ানুভূতি অসাড় হয়ে যাওয়ার ফলে চাবপাশের পরিবেশে তাদের মনোযোগ আকর্ষণকারী কোনো-কিছুর দেখা পাওয়া যায় না। সুতরাং সময়ের সদ্ব্যবহারের জন্যে নয়, কেবল সময়কে ভরিয়ে তোলার জন্যে নারী নিজেকে অত্যন্ত ব্যস্ত রাখে। আমাদের প্রাত্যহিক জগৎ বাদ্যযন্ত্রের রীডের মতো, তার যথার্থ মূল্য তার মধ্যে নেই। কিন্তু যাদের ক্ষমতা ও মনোযোগের সুস্থিরতা আছে, তারা এই প্রাত্যহিক জগতের শূন্যতার মধ্য দিয়ে অনন্ত যে সংগীত বাজিয়ে চলেছেন, তা শুনতে পায়। কিন্তু নারী যখন বস্তুর মূল্যে বস্তুকে বিচারের অভ্যাস গড়ে তোলে, তখন প্রত্যাশা করা যায় যে নারী

আপনার (পুরুষের) মনকে ছিন্নভিন্ন ক'রে দেবে; আপনার আত্মাকে নারী তার আপন অনন্তের সঙ্গে মিলনের ফাঁদে ফেলবে; এবং বিরামহীন চলাফেরার অর্থহীন শব্দে আপনাকে দিয়ে নারী অনন্তের শ্বাসরুদ্ধ ক'রে দিতে চেষ্টা করবে।

আমি এ কথা ইঙ্গিত করছি না যে গার্হস্থ্যজীবনই নারীর একমাত্র জীবন। আমি বলতে চাই যে, মানবিক জগৎ নারীর জগৎ— তা গার্হস্থ্যজীবনই হোক আর জীবনের অন্যান্য কর্মে পূর্ণ হোক— সবই মানবিক ক্রিয়া— সংগঠন গড়ে তোলার বিমূর্ত প্রয়াস মাত্র নয়।

যেখানেই কিছু ব্যক্তিগত ও মানবিক গুণসম্পন্ন বস্তু দেখা যায়, সেখানেই নারীর জগৎ প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক ব্যক্তি গার্হস্থ্যজীবনে তার ব্যক্তিগত মূল্য খুঁজে পায়, সুতরাং তার মূল্য বাজারের মূল্য নয়, তা ভালোবাসার মূল্য। অর্থাৎ ঈশ্বর অসীম করুণাভরে সকল প্রাণীর উপর যে ভালোবাসা অর্পণ করেছেন, তারই মূল্য। এই গার্হস্থ্যজীবন নারীর প্রতি ঈশ্বরেব উপহার। এই জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে চার দিকে নারী তার ভালোবাসার দীপ্তি বিকীর্ণ করতে পারে, এবং যখন ডাক আসে তখন তার নারীস্বভাবের প্রমাণ দেবার জন্য এই জগৎকে ছেড়ে যেতেও পারে। কিন্তু এই সত্য অগ্রাহ্য করা যায় না, যে মুহূর্তে নাবী তার মায়ের কোলে জন্মেছে, সে মুহূর্তে সে তার আপন সত্য জগতের— মানবিক সম্পর্কে ভরা জগতের— কেন্দ্রে জন্মেছে।

যেখানে জীবনের রহস্যে অনন্ত কৌতূহল রয়েছে, সকল বস্তুর সেই কেন্দ্রস্থলে উপরিভাগের বাধা ভেদ ক'রে নারী পৌঁছতে পারে। সেজন্যে তাকে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। পুরুষের এই শক্তি এতটা পরিমাণে নেই। যদি নারী নষ্ট না করে, তবে এই

শক্তি তার আছে। আর সেইজন্যে অ-সাধারণ গুণের জন্য যে-সব প্রাণীকে কেউ ভালোবাসে না, নারী তাদের ভালোবাসে। পুরুষকে তার নিজস্ব জগতে কর্তব্য পালন করতে হয়। সেখানে পুরুষ সর্বদাই শক্তি, সম্পদ ও নানা প্রকারের সংগঠন সৃষ্টি করছে। কিন্তু ঈশ্বর নারীকে সাধারণ বস্তু ও ঘটনায় ভরা জগতকে ভালোবাসার জন্যে পাঠিয়েছেন। যে পরীর জগতে যুগ যুগ ধরে সুন্দরী পরী যাদুকাঠি না ছোঁয়ানো পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকে, নারী সে জগতের অধিবাসিনী নয়। ঈশ্বরের জগতের সর্বত্রই নারীর হাতে যাদুকাঠি আছে। এই যাদুকাঠি তাদের হৃদয়কে জাগিয়ে রাখে। এই যাদুকাঠি সম্পদের সোনার কাঠি নয় বা ক্ষমতার লৌহদণ্ড নয়।

আমাদের সকল অধ্যাত্ম-গুরুরা ব্যক্তির অনন্ত মূল্য ঘোষণা করেছেন। আধুনিক যুগের প্রবল জড়বাদ রক্ত-তৃষ্ণ সংগঠন-দেবতার কাছে ব্যক্তিকে নিষ্ঠুরভাবে বলি দিচ্ছে। যখন ধর্ম জড়বাদী, যখন দেবতার অকল্যাণ-শক্তিতে ভীত হয়ে বা সম্পদ ও ক্ষমতার লোভে মানুষ দেবতাদের পূজা করে, তখন পূজার আচারানুষ্ঠান নিষ্ঠুর হয় এবং অসংখ্য বলি দাবি করা হয়। মানুষের অধ্যাত্মজীবনের বিকাশের সঙ্গে আমাদের পূজা হয়ে ওঠে ভালোবাসার পূজা।

সভ্যতার বর্তমান পর্যায়ে যখন ব্যক্তির বিনষ্টি কেবল চর্চা করা হচ্ছে না, তাকে গৌরব দান করা হচ্ছে, তখন নারী তার নারীত্বের জন্যে লজ্জা অনুভব করছে। কারণ ঈশ্বর তাঁর প্রেমের বাণীসমেত নারীকে ব্যক্তির অভিভাবক ক'রে পাঠিয়েছেন, আর এই ঐশ্বরিক কর্মে নারীর কাছে স্থল ও নৌ-বাহিনী, পার্লামেণ্ট, দোকান-বাজার ও কারখানা অপেক্ষা ব্যক্তি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে

ঈশ্বরের নিজস্ব বাস্তবতার মন্দিরে নারী ঈশ্বরের কাজ করে; সেখানে ক্ষমতা অপেক্ষা ভালোবাসার মূল্য বেশি।

পুরুষ ক্ষমতাগর্বে গর্বিত হয়ে জীবনপূর্ণ বস্তুসমূহকে ও মানবিক গুণসম্পন্ন সম্পর্কসমূহকে বিদ্রূপ করছে দেখে এক বিশালসংখ্যক নারী পরুষকণ্ঠে চীৎকাব ক'রে প্রমাণ করতে চাইছে যে তারা নারী নয়, এবং যেখানে তারা ক্ষমতা ও সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করে সেখানেই তারা সত্যরূপে প্রকাশিত। বর্তমান যুগে যখন এই-সব নারীকে মানবজাতির জননীরূপে দেখা হয়, ও অস্তিত্বেব মূল প্রয়োজনসাধিকারূপে এবং সমবেদনা ও ভালোবাসার গভীরতর আধ্যাত্মিক প্রয়োজন-সাধিকারূপে দেখা হয়, তখন তাদের গর্ব আহত হয়।

পুরুষ তার বিমূর্ত ভাবের তৈরি-করা মূর্তি অর্চনায় খুব সাধু উৎসাহ দেখায় বলে নারী লজ্জায় তার নিজস্ব সত্য-ঈশ্বরকে ভেঙে ফেলছে। এই ঈশ্বর ভালোবাসায় আত্মোৎসর্গেব পূজার জন্য অপেক্ষা করছেন।

সমাজের যে কঠিন ভিত্তিস্তবের উপর নারীর জগৎ প্রতিষ্ঠিত, সেই স্তরের তলে তলে বহুকাল ধরে পরিবর্তন ঘটে চলেছে। সম্প্রতি বিজ্ঞানের সাহায্যে সভ্যতা ক্রমশঃই পরুষ ভাবে বেড়ে চলেছে। তাব ফলে ব্যক্তির পূর্ণ সত্য ক্রমশঃই বেশি পরিমাণে অগ্রাহ্য হচ্ছে। আজ প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি-সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনধিকার-প্রবেশ করছে, এবং আইনের কাছে মানবিক আবেগ পবাভূত হচ্ছে। কোনো কোনো সমাজ পরুষ ভাবাদর্শের দ্বারা অতিমাত্রায় নিয়ন্ত্রিত হবার ফলে শিশুহত্যা চলেছে। তার ফলে জন-সংখ্যায় নাবী-উপাদান নিষ্ঠুরভাবে যতটা সম্ভব কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। আধুনিক সভ্যতায় অন্যরূপে একই ব্যাপার ঘটেছে। ক্ষমতা ও সম্পদের অপবিমিত

লালসায় এই সভ্যতা নারীকে তার জগতের বেশির ভাগ থেকে বঞ্চিত করেছে, এবং ঘর ক্রমশঃই কর্মস্থলের ভিড়ে হঠে যাচ্ছে। এই আধুনিক সভ্যতা সারা জগৎকে নিজের কাজের জন্য অধিকার করছে, তার ফলে নারীর জন্যে কোনো জায়গাই থাকছে না। এই উৎসাদন নারীকে কেবল আহত করছে না, তাকে অপমানিত করছে।

কিন্তু মানুষের আক্রমণাত্মক শক্তির ঠেলায় নারীকে চিরকাল নিছক সজ্জার ক্ষেত্রে আটকে রাখা যাবে না। কারণ সভ্যতার ক্ষেত্রে নারী কম প্রয়োজনীয় নয়। সম্ভবতঃ পুরুষ অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসে বিশাল ধ্বংস-পর্বগুলি যখন অতিক্রান্ত হয়েছে, তখনো পৃথিবী পূর্ণতার কোমলতায় উপনীত হয় নি। সেই কোমলতা শক্তির হিংস্র প্রকাশকে ঘৃণা করে। পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বী বাণিজ্য ও সংগ্রামী শক্তিসমূহের উচিত, মানব-সভ্যতার পূর্ণতার পর্যায়কে পথ ছেড়ে দেওয়া। এই পূর্ণতার শক্তি সৌন্দর্য ও মঙ্গলের গভীরে নিহিত। আমাদের ইতিহাসের গোড়াতেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা বহুদিন ধরে রয়েছে। তার ফলে শক্তিতে অধিষ্ঠিত দলের হাত থেকে ব্যক্তির প্রতিটি অধিকার জোর ক'রে ছিনিয়ে নিতে হয়েছে, এবং যা মানুষের পক্ষে কল্যাণকর তাকে পাবার জন্য মানুষকে অসতের সাহায্য নিতে হয়েছে। কিন্তু এই ধরণের বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হতে পারে না। বারেবারেই তাকে হেরে যেতে হয়। কারণ এই বন্দোবস্তের নানা খাঁজে ও ফাটলে হিংসার বীজ থেকে যায়, অনৈক্যের শিকড় অন্ধকারে ছড়িয়ে যায়, এবং যখন একেবারে অপ্রত্যাশিত তখনি তা ভেঙে পড়ে।

সুতরাং যদিও ইতিহাসের আধুনিক যুগে পুরুষ তার পরুষ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করছে এবং বিকাশলাভের জীবন্ত সূত্রকে অস্বীকার

ক'রে পাথরের পর পাথর সাজিয়ে তার সভ্যতাকে গড়ে তুলছে, তথাপি পুরুষ নারীর স্বভাবকে ধুলোয় গুঁড়ো ক'রে দিতে পারে নি বা তার মরা উপাদানে মিশিয়ে ফেলতে পারে নি। নারীর ঘর ভেঙে যেতে পারে, কিন্তু নারীকে হত্যা করা যায় নি এবং যাবে না। নারী কেবল পুরুষের একচেটিয়া ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে তার জীবিকার স্বাধীনতা চাইছে না, সেই সঙ্গে পুরুষের একচেটিয়া সভ্যতার বিরুদ্ধেও লড়াই করছে, কারণ সেখানে পুরুষ প্রতিদিন নারীর হৃদয় ভেঙে দিচ্ছে ও তার জীবনকে নিঃসঙ্গ করে তুলছে। মানবিক সৃষ্টির জগতে আপন ভার অর্পণ ক'রে নারী অবশ্যই লুপ্ত সামাজিক সমতাকে ফিরিয়ে আনবে। প্রতিষ্ঠানের দানবীয় রথ আজ জীবনের রাজপথে কড়কড় শব্দে আর্তনাদ করছে, দুঃখ ও বিচ্ছেদ ছড়াচ্ছে। কারণ জগতের সব-কিছুর সামনে তার ঊর্ধ্বশ্বাস গতি। সুতরাং ব্যক্তির বিক্ষত ও বিকৃত জগতে অবশ্যই নারীর আবির্ভাব হবে। নারী অবশ্যই প্রতিটি ব্যক্তিকে— অকর্মা ও হীনগৌরবকে— আপন বলে দাবি করবে। কর্মনৈপুণ্য-বিজ্ঞানের তীব্র বিদ্রূপ হাসি থেকে নারী অবশ্যই সযত্নে মানবিক আবেগের সুন্দর ফুলগুলিকে রক্ষা করবে। লোভের সংগঠিত শক্তি মানব-জীবনের স্বাভাবিক অবস্থাকে বঞ্চিত ক'রে যে অপবিত্রতা সৃষ্টি করেছে, নারী অবশ্যই তা দূর করে দেবে। আজ সময় এসেছে, নারীর দায়িত্ব সর্বকালের তুলনায় বিশেষ বেড়ে গেছে ; গার্হস্থ্যজীবনের সীমা ছাড়িয়ে নারীর কর্মক্ষেত্র বহুদূর প্রসারিত হয়েছে। আজ অপমানিত ব্যক্তিদের জগৎ নারীর কাছে আবেদন পাঠিয়েছে। এই-সব ব্যক্তি অবশ্যই তাদের সত্য মূল্যকে খুঁজে পাবে, আবার সূর্যালোকে মাথা তুলে দাঁড়াবে এবং নারীর ভালোবাসার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রেমে তাদের আস্থা নতুন

করে জ্ঞাপন করবে।

মানুষ আজকের সভ্যতার অসঙ্গতি দেখেছে। এই অসঙ্গতির ভিত্তি জাতীয়তাবাদ, অর্থাৎ অর্থনীতি, রাজনীতি ও আনুষঙ্গিক সামরিক মতবাদ। বিশাল যান্ত্রিক সংগঠনগুলির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াবার জন্য মানুষ তার স্বাধীনতা ও মানবিকতা হারাচ্ছে। সুতরাং আশা করা যায়, পরবর্তী সভ্যতা নিছক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে না, বরং বিশ্বব্যাপী সামাজিক সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। পারস্পরিক আদানপ্রদানের উপরেই তা প্রতিষ্ঠিত হবে, কর্মনৈপুণ্যের অর্থ-নৈতিক আদর্শের উপর হবে না। আর তখন নারী তার সত্য ভূমিকা খুঁজে পাবে।

পুরুষ বিশাল দৈত্যাকার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে বলে আজ ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছে যে, এই রূপান্তরিত শক্তির মধ্যে পূর্ণতার স্বভাব খানিকটা আছে। এই অভ্যাস পুরুষের মধ্যে রয়ে গেছে এবং তার ফলে মানুষের বর্তমান অগ্রগতির আদর্শে কোথায় সত্যকে হারাচ্ছে, তা বোঝা পুরুষের পক্ষে কঠিন।

কিন্তু নারী যদি তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়, তবে আধ্যাত্মিক সভ্যতা গঠনের এই নতুন কাজে সে তার নবীন মন ও সকল সহানুভূতি-শক্তি প্রয়োগ করতে পারে। অবশ্য নারী চঞ্চল হতে পারে, বা তার দৃষ্টিভঙ্গী সঙ্কীর্ণ হতে পারে, এবং সে তার জীবনের মহৎ উদ্দেশ্যকে হারাতে পারে। এই সভ্যতা থেকে নারী বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে ও পুরুষের পিছনে গুপ্ত জীবন যাপন করছে বলেই আমার মনে হয় অপেক্ষমান আগামী সভ্যতায় নারী তার ক্ষতিপূরণ পাবে।

আর এই-সব মানুষ যারা তাদের ক্ষমতার গর্ব করে ও শোষণের

ক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক মনোভাব পোষণ করে, যারা তাদের প্রভুর শিক্ষার সত্য অর্থে বিশ্বাস হারিয়েছে যে নম্র বিনীত মানুষই পৃথিবীকে পাবে, তারা জীবনের পরবর্তী প্রজন্মে পরাভূত হবে। প্রাচীন যুগে, প্রাগৈতিহাসিক কালে ম্যামথ ও ডাইনোসরদেব মতো বিশালকায় প্রাণীদের ভাগ্যে যা ঘটেছিল, তাবই পুনরাবৃত্তি হবে। তারা পৃথিবীতে তাদের উত্তরাধিকার হারিয়েছে। প্রচণ্ড প্রয়াসের উপযোগী দৈত্যেব মতো পেশী তাদেব ছিল, কিন্তু পেশী-শক্তিতে দুর্বলতর ও অনেক কম আয়তনবিশিষ্ট প্রাণীদের কাছে তাদের হেরে যেতে হয়েছিল। আর ভবিষ্যৎ সভ্যতাক্ষেত্রেও দুর্বলতর প্রাণী নারী— অন্ততঃ বাহ্যিক রূপে যে দুর্বল, পেশীশক্তিতে যে হীনতব ও যে সর্বদাই বিশালকায় প্রাণী পুরুষের ছায়ায় পড়ে আছে— সেই নারী তার যোগ্য ভূমিকা খুঁজে পাবে, এবং ঐ-সব বিশালকায় প্রাণীদেব পথ ছেড়ে দিতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ চতুর্থবারের বিদেশ-যাত্রায় (মে ১৯১৬ - মার্চ ১৯১৭) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে ঐ দেশে তাঁহার মনোমত বিষয়ে কতকগুলি বক্তৃতা দিতে প্রতিশ্রুত হন। সেই বক্তৃতামালাই পরবর্তী কালে Nationalism ও Personality এই দুই গ্রন্থে সংকলিত হয়। ম্যাক্‌মিলান-কর্তৃক ১৯১৭ মে মাসে প্রকাশিত শেষোক্ত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রথম প্রচারিত হইল।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ৩ মে ১৯১৬ তারিখে সি এফ. এন্‌ড্রুজ, উইলিয়াম পিয়র্সন ও শ্রীমুকুল দে'কে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা হইতে জাপানী 'তোষা মারু' জাহাজে কবি এবারের যাত্রা শুরু করেন— 'তখন জাহাজে বসিয়া যে প্রবন্ধগুলি লেখেন সেগুলি'[১] এই Personality গ্রন্থের অন্তর্গত। কবি জাপানে কিছুকাল থাকিয়া (২৯ মে - ৭ সেপ্টেম্বর) ও বক্তৃতাদি দিয়া, পুনরায় 'কানাডা মারু' নামে এক জাপানী জাহাজে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র-অভিমুখে যাত্রা করেন ও ১৮ সেপ্টেম্বর তারিখে সে স্থলে উপনীত হন। ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রথম যে বক্তৃতা পাঠ করেন তাহা Nationalism গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। নভেম্বর ও ডিসেম্বরের বিভিন্ন তারিখে নিউইয়র্ক্ বোস্টন বাফেলো প্রভৃতি শহরে Personality গ্রন্থের বিভিন্ন বক্তৃতাগুলি পাঠ করেন। ২১ জানুয়ারি ১৯১৭ তারিখে জাপান হইয়া দেশে ফিরিবার উদ্দেশ্যে সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো বন্দর হইতে যাত্রা করেন।

Personality গ্রন্থে আলোচিত প্রসঙ্গগুলি অনেক সময় একই ভাষায়, কদাচিৎ একই প্রকার উপমা অলংকার ও দৃষ্টান্ত -সহযোগে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পূর্ববর্তী নানা বাংলা রচনায় বিবৃত করিয়া থাকিলেও, কোনো প্রবন্ধই পূর্বরচিত কোনো বাংলা প্রবন্ধের ইংরাজি ভাষান্তর নহে। বিশেষ দৃষ্টান্ত-স্বরূপে দ্বিতীয় প্রবন্ধ (ইংরেজিতে : The World of Personality)

১ রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৫৫), পৃ ৪৩৪

উল্লেখযোগ্য— ১৩২১ আশ্বিনের সবুজপত্রে মুদ্রিত, পরে 'সঞ্চয়' গ্রন্থে সংকলিত, 'আমার জগৎ' প্রবন্ধের সহিত ইহার সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য উভয়ই যে-কোনো সুধী পাঠকের দৃষ্টি এড়াইবে না।

বর্তমান গ্রন্থের বাংলা ভাষান্তর করিয়া দিয়াছেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—মুদ্রণকালেও নানাভাবে তাঁহার সহযোগিতা পাওয়া গিয়াছে।

—